জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব

بسم الله الرحمن الرحيم

জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব

মসিহ মুহাজেরী
কর্তৃক রচিত

অনুবাদ : অধ্যক্ষ রইস উদ-দীন আহমদ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে
ইসলামী বিপ্লবের শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ
ইসলামী বিপ্লব

প্রকাশনায় ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
বাড়ী নং ৩৯, সড়ক নং ২,
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা—৫

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৮৫'র এপ্রিল।

জিহাদ-ই-সাজান্দেগী'র কেন্দ্রীয় কমিটির
বহিঃ যোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ তিতাস প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন,
(টিপুসুলতান রোড) রথখোলা, ঢাকা—১
ফোন ঃ ২৫১৬৯৪
২৩৯৪১৫

Written by : MASIH MUHAJERI
Translated by : Principal Rais-ud-Din Ahmad
Published by : Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran.
House No. 39, Road No. 2, Dhanmondi
Residential Area, Dhaka - 5.
Date of Publication : April, 1985.

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

ইরানের গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ৫ম বার্ষিকীর প্রাক্কালে এবং পাঁচ বছর যাবৎ সংগ্রাম ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের পরে আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিবর্গের ও তাদের চরদের সকল ঔপনিবেশিক চক্রান্তের ওপর আমাদের মহান বিজয় অবলোকন করছি, এমনই সময়ে উদ্‌যাপন করছি 'টেন ডেজ্ ডন্'।

বিপ্লবের চরম শত্রু খুনীদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য শহীদের আত্মদান সত্ত্বেও এই বিপ্লবী ইসলামী জাতি পর্বতের ন্যায় অচল-অটল থেকে প্রতিহত করছে সকল চক্রান্ত।

অঙ্গীকারবদ্ধ ইরানী জনগণ নিজেদের পুনরুজ্জীবিত ইসলামী পথ অবিচলভাবে অনুসরণ করছে। এ পথ এখন সকল মুসলমান ও নিপীড়িত জাতির জন্যে একটি আদর্শে রূপ নিয়েছে, সৃষ্টি করেছে আধ্যাত্মিকতার এক নব যুগ। আর এ নবযুগ দর্শনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের বলদর্পী উদ্ধত শক্তিবর্গ।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরেও 'টেন ডেজ ডন' উদ্‌যাপন পরিষদ এ মহতী উপলক্ষে এবং ইসলামী বিপ্লবের প্রাণস্পর্শী রূপ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রিয় পাঠকবর্গের জন্যে কয়েকটি ভাষায় কিছু বই ও পুস্তিকা উপহার দিচ্ছে। এ বিপ্লবের ইসলামী ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা তুলে ধরাও একটি উদ্দেশ্য হিসেবে এ উদ্যোগের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

এই বইটি ঐ প্রকাশনাগুলোরই একটি। আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যেই বইটি প্রকাশিত হল।

সকল ক্ষেত্রে ইসলামের ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে জানাই শুভ কামনা। আন্তর্জাতিক অশুভ শক্তিসমূহ পরাজিত হবেই—এ আমাদের আশা। সকল নিপীড়িত, অধীনতা পাশে আবদ্ধ জনগণের মুক্তির জন্যে দোয়া করছি।

'টেন ডেজ ডন' উদ্‌যাপন পরিষদ।

www.pathagar.com

সূচনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিপ্লবের বিজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিনিধিদল পাঠায়। জনগণের কাছে এ বিপ্লবের লক্ষ্য ও কার্যাবলী তুলে ধরে বিপ্লবকে পরিচিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ প্রতিনিধিদলকে জনগণ যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায় ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করে, তার আন্তরিক প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানের ঘটনাবলী, ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃতি ও বিপ্লবোত্তর ইরানের ঘটনাবলী সম্পর্কে এসব দেশের জনগণের তথ্যের অভাব ও অজ্ঞতা আশংকাজনক। এ সফরকালে প্রতিনিধিদল বিভিন্ন স্তরের জনগণ, বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামী আন্দোলনের সদস্যদের সাথে মিলিত হয়। এর ফলে প্রতিনিধিদল এদেরকে ইরানের প্রকৃত অবস্থা জানানোর সুযোগ পায়। প্রতিটি স্থানেই জনগণ ইরানে ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে তথ্য জানার জন্যে যে বিপুল আগ্রহ দেখায় প্রতিনিধিদল তাতে আনন্দিত হয়। অপরদিকে, এটা দুঃখজনক যে, ঐসব দেশের সরকারসমূহ, যারা পূর্ব বা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাধা, যারা ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যে উদাসীন বা নির্লিপ্ত, কার্যতঃ আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদকেই সহায়তা করছে, পূর্ব বা পশ্চিমপন্থী সরকারসমূহ গণমাধ্যম ও ধ্বংসাত্মক প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের ভাবমূর্তি ও অস্তিত্ব ধ্বংস ও দূষিত করার চেষ্টা করে। তাদের আশংকা, একদিন তাদের দেশের জনগণও সত্য অনুধাবন করবে এবং সেই পথ বেছে নেবে, ইরানের জনগণ যে পথ বেছে নিয়েছে। একইভাবে নিপীড়নমূলকভাবে জনগণকে শাসন করছে এ সব সরকার এবং অপরাধী শাহের পরিণতি যা হয়েছিল, এসব সরকারের পরিণতিও তাই হবে। তাই ইরানের মহান মুসলমান জাতির গৌরবোজ্জ্বল অগ্রগতি সম্পর্কে নিজেদের জাতিকে অচেতন ও অজ্ঞ রাখার চেষ্টায় এসব দেশের সরকার আন্তর্জাতিক নিপীড়নের অবকাঠামো টিকিয়ে রাখতে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা-গুলোর সাথে সহযোগিতা করে। বঞ্চিত, শোষিত উপনিবেশ দেশগুলোতে স্থায়ী শাসন নিশ্চিত করতে এসব সরকার নিজেদের দেশের কল্যাণের বিষয়টি একপাশে সরিয়ে রেখেছে, পুরোপুরি এড়িয়ে গেছে জনতার দুর্দশা।

বর্তমানে বিশ্ব নিপীড়নের এ কদর্য চেহারা এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে বহু জাতির অজ্ঞতা এসব প্রতিনিধিদলের নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদেরকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের চরদের দমনের কাজ দ্রুততর করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। আমরা মনে করি, ইরানের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশ্বের

www.pathagar.com

জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরার জন্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। বিশ্ব নিপীড়ক দাসত্বের যে শৃংখলে নিপীড়িতদের বেঁধেছে, তা ভেঙ্গে ফেলতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে দাসত্ব বিভিন্নভাবে বিরাজ করছে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও আড়ালে। কেবল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশেই এটা সীমিত নয়। আধুনিক দাসত্বের নব-অবয়ব আমেরিকা, রাশিয়াতে যেখানে মানুষ সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক শোষণের শিকার, সেখানেও নব-অবয়বে আধুনিক দাসত্ব রয়েছে। তাই বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের মর্মবস্তু ও লক্ষ্যমালা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্যে ইরানী জনগণের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো অতি মহান ও জটিল কাজ।

এ মহান কর্তব্য পালনে, প্রত্যেকেরই উচিত সাধ্যমত দায়িত্ব গ্রহণ করা।

বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে ইসলামী বিপ্লবের অভিপ্রায়, দ্বিতীয়াংশে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তৃতীয়াংশে বিজয়ের পর থেকে এ বই লেখা পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লবের কার্যাবলী, সমস্যাবলী, বাধাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

লেখার ধারা ও চিন্তার প্রবাহকে বিঘ্নিত না করে সংক্ষেপে প্রয়োজনী বিষয়াবলী এসব অধ্যায়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি বিশেষ করে বিদেশের জনগণের কাছে ইসলামী বিপ্লবকে জনপ্রিয় করে তুলতে লেখা হয়েছে। তবে এটি এমনভাবে লেখা যাতে ইরানীরাও বিশেষতঃ নব বংশধররা সমস্যার উৎস বুঝতে পারেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে, বইটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে প্রয়োজনীয় হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ইরানের অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলী উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সকল নিপীড়িত জাতির জন্যে অমূল্য সম্পদ।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিশ্বের সকল জাতির জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও তা ইরানী জাতির মত অবস্থায় এখনও পতিত অন্যান্য মুসলমান দেশের জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর ইচ্ছা, এ বই ইরানের মুসলমান জাতির সংগ্রামের ধরন তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, স্বয়ং লেখক বিগত ৫ বছর যাবৎ বিপ্লবের প্রধান স্রোতধারায় রয়েছেন। বইতে উল্লেখিত বহু বিষয় লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।

ইসলাম, মুসলমান ও বিশ্বের সকল বঞ্চিত, নিপীড়িত জনতার আরো সাফল্যের কামনায়।

মসিহ মুহাজেরি

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

ইসরাইল সরকারের সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সম্পর্ক রাখছে বলে অভিযোগ তুলে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে এক ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। স্কানডিনেভীয় দেশসমূহ থেকে কেনা পণ্য পরিবহণে ইরানকে ইজারা দেয়া একটি আর্জেন্টেনীয় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে ভয়েস অব আমেরিকা ও রেডিও ইসরাইল শুরু করে এক প্রচার অভিযান। ইরান ত্যাগের পর বিমানটি রহস্যজনকভাবে তুরস্ক-রুশ সীমান্তে বিধ্বস্ত হয়। ইহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বেতার কেন্দ্রগুলো এ ঘটনাকে কাজে লাগায়, গুজব ছড়ায় যে, বিমানটি ইসরাইলে তৈরী অস্ত্র ইরানে নিচ্ছিল।

সেপ্টেম্বরে ইহুদীবাদী চক্রের প্রচেষ্টা জোরদার হয়, এ মাসের মাঝামাঝি সময় পৌঁছায় তুঙ্গে। অকস্মাৎ ভয়েস অব আমেরিকা প্রচার করে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার তেহরানে ফিলিস্তিনী দূতাবাস হিসেবে ব্যবহৃত ভবনটি ফেরত নিয়েছে। শাহ আমলে এ ভবনটি ইহুদীবাদীদের হাতে ছিল। তৎক্ষণাৎ তেহরানে ফিলিস্তিনী দূতাবাস এ খবরের প্রতিবাদ জানায়।

প্যারিস থেকে আবুল হাসান বনি সদর জানায়, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে। এ কথা বলতে গিয়ে বনি সদর ভুলে যায় যে এ জন্যে খোদ তাকেই দায়ী হতে হবে।

ইরানের সরকার ও জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় যে, শত্রুরা আরেকটি ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপক প্রচারণার একটিই লক্ষ্য। তা হচ্ছে, ইরানে একটি অভ্যুত্থান ঘটলে, তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের জন্যে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা। তারা তত্ত্ব দাঁড় করায় যে, বিশ্বের জনগণ, এমনকি ইরানী জাতিকে যদি বোঝানো যায় যে, ইসরাইলের সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সরকারের সম্পর্ক আছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ গ্রহণ করবে যে, ঐ ধরনের সরকার প্রধানরা সৎ নয়। "আজ ইরান, কাল, ফিলিস্তিন" এ মনোভঙ্গী সত্ত্বেও তারা ফিলিস্তিনী মুসলমান ভাইদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাস, এরকম পরিস্থিতিতে এ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হলে ইরানের জনগণ নির্লিপ্ত থাকবে এবং বিশ্বের জনগণ মনে করবে যে, নিজেদের জনগণের কাছে অসৎ নেতাদের বিরুদ্ধে এটা এক বিপ্লবী কাজ।

সিআইএ এবং মোসাদ বিশ্লেষকরা ভুলে গেছে যে, ইরানী জাতি বিপ্লব সম্পন্ন করে ও এ সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে এ ধরনের প্রচারণায় প্রতারিত হবে না। এ বিশ্লেষকরা নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি পদ্ধতির কারণে বুঝতে পারেনি যে, বিশ্বের জনগণ ইরানের ইসলামী বিপ্লব ভালবাসে এবং তারাও এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবে না।

পটভূমি তৈরী হল—শুরু হল অভ্যুত্থান। ১৯৮০'র ৩০শে আগস্ট, রবিবার (৮ই শাহরিভার) বেলা ৩টায় প্রধানমন্ত্রীর ভবনের একটি কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটলো একটি বোমার। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী রাজাই, প্রধানমন্ত্রী হোজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ জাভেদ বাহোনর এবং প্রধামন্ত্রীর দু'জন কর্মচারী মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ হন, বরণ করেন শাহাদতের বিরল সম্মান। ইরানী জনগণের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে অনুমান করেননি তারা। ১৯৮০'র ২৮শে জুন আয়াতুল্লাহ বেহেশতিসহ ৭২ জন শহীদের দাফনের সময়ের চেয়ে এবার ইরানী জনগণ আরো সক্রিয়ভাবে বিক্ষোভ করল। তারা বিপ্লবের নেতা ও এর কর্তৃপক্ষের প্রতি সমর্থন জানাল, প্রতিবিপ্লবী ও আমেরিকান সরকারের চরদের বিরুদ্ধে দাবী করল কঠোর শাস্তি। "আমেরিকা সরকারের পতন হোক" স্লোগান দিয়ে তারা বিশ্বের জনগণের কাছে বিপ্লবী সচেতনতা প্রতিধ্বনিত করল, প্রমাণ করল কোন ষড়যন্ত্রই বিপ্লব রুখতে পারে না।

এ ঘটনাগুলো ইরানী জনগণের সংকল্পবদ্ধতা দৃঢ় করতে যেমন সাহায্য

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সূচনা
প্রস্তাবনা

প্রথম অংশ—বিপ্লবের উদ্দেশ্য

বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী বিপ্লবের উৎসমূল ১
ইরানে ইসলাম উৎখাতের চর পাহলভী রাজবংশ ৩
সূচনাস্থল ৬
৫ই জুনের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান ৮
ইরানে বি-ইসলামীকরণের চরমসীমা ৯
দরবারের ইসলাম ১০
সরকারী সাম্যবাদ ১৩
এক মিথ্যা জাতীয়তাবাদ ১৪
পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ ১৬
প্রকৃত অভিপ্রায় ২০
প্রেরণাদায়ী অন্যান্য বিষয় ২১
সাংস্কৃতিক পরনির্ভরশীলতা ২২
অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ২৪
সামরিক নির্ভরশীলতা ২৬
রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ২৭
স্বাধীনতা দমন-পীড়ন ২৯

দ্বিতীয় অংশ—বিপ্লবের বিজয়

পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব ৩২
বিপ্লবী শক্তিসমূহ ৩৭
দুই প্রবণতা ৩৮
বিপ্লবীকরণ প্রবণতা ৪১
পরাস্ত চক্রান্ত ৪৩
বিপ্লবের শক্তিসমূহের গঠন-প্রকৃতি ৪৬
বিপ্লবের নেতৃত্ব ৪৭
প্রতিশ্রুত মুহূর্ত ৫১

তৃতীয় অংশ—বিজয়ের পরে

সুদীর্ঘ পথ ৫৪
স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনসমূহ ৫৭
বিপ্লবী সংগঠনসমূহ ৫৯

১। ইসলামী বিপ্লবী কমিটি ৬০
২। ইসলামী বিপ্লবী আদালত ৬১
৩। ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী ৬৪
৪। ত্রাণ কমিটি ৬৫
৫। জিহাদ-ই-সাজান্দেগী ৬৬
৬। সমাবেশ সংগঠন ৭০
৭। গৃহ সংস্থান ফাউণ্ডেশন ৭১
৮। মুস্তাজাফিন ফাউণ্ডেশন ৭২

www.pathagar.com

৯। শহীদ ফাউণ্ডেশন ৭২
১০। সাক্ষরতা আন্দোলন ৭৩
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা ৭৩
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার স্তম্ভসমূহ ৭৫
১। জনতার ভোট ৭৫
২। ইসলামী বিধানসমূহ ৭৭
ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাঠামো ও গঠন-প্রকৃতি ৭৮
সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ ৭৮
সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ ৭৯
বেলায়েত-ই-ফকিহর নেতৃত্ব ৮০
ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী ৮৩
ইসলামী ঐক্য ৮৩
ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৮৪
জাতীয়তা ও জাতিসমূহের অধিকার ৮৫
নারী অধিকার ৮৭
স্বাধীনতা ৮৭
বৈদেশিক নীতি ৮৮
অর্থনৈতিক নীতি ৮৯
শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ৯১
সামরিক নীতি ৯৩
কার্যাবলী ৯৪
ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ ৯৪
পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী ৯৭
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের কার্যাবলী ১০০
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী ১০৩
তেহরানে আমেরিকান গোয়েন্দা আখড়া দখল ১০৫
অর্থনীতি ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী ১০৯
সামরিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী ১১৩
ষড়যন্ত্র ১১৬
সংস্কার নয়, বিপ্লব ১১৬
ইরানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপনের চক্রান্ত ১১৯
সরকারের প্রধান ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শন ১২০
নেতৃত্বে ভাঙ্গন ধরানো ও প্রধান ব্যক্তিদের খুনের চক্রান্ত ১২১
তাবাস ষড়যন্ত্র ১২২
নওজেহ'র ব্যর্থ অভ্যুত্থান ১২৫
ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ১২৫
ধাপে ধাপে অভ্যুত্থানের জন্যে বনি সদরের ব্যর্থ চেষ্টা ১২৬
তিরে'র ব্যর্থ অভ্যুত্থান ১৩০
ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ১৩১
বিপ্লব রফতানী ১৩৩
সম্পূরক ১৪৩

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী বিপ্লবের উৎসমূল

প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ ও বিদ্বজ্জন মীর্জা মুহাম্মদ হাসান হুসেইনী শিরাজীর লেখনীর কাছে পরাভব মানতে হল তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তি বৃটিশ রাজশক্তিকে। এ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বৃটিশ রাজশক্তি ইসলামের ক্ষমতা কত প্রবল, তা উপলব্ধি করল। মীর্জা মুহাম্মদ হাসান হুসেইনী শিরাজী সাধারণের কাছে মীর্জা শিরাজী নামেই পরিচিত। মীর্জা শিরাজীর এক ধর্মীয় ঘোষণায় বলা হয়, "রাহমানুর রাহীম আল্লাহর নামে বলছি, "এখন থেকে তামাক সেবন ও ধূমপান—ইমামের (তাঁর উপর আল্লাহর রহম ও প্রশংসা বর্ষিত হোক) বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল।" ক্রমান্বয়ে জনগণের সচেতনতা লাভ এবং জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনার পুনরুত্থানের ফলে ইসলামী দেশগুলোতে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, বৃটিশরা তা অনুমান করতে শুরু করল। তারা বুঝল যে, এ সমস্যা "উপনিবেশবাদের পুরনো অস্তিত্বকে" গুরুতর ঝামেলায় ফেলবে। ইরানের রাজতান্ত্রিক সরকারের কর্মচারীরা স্বচক্ষে দেখল, ইরানী জনতাকে মীর্জা শিরাজীর ঘোষণা জানানোর সাথে সাথে জনগণ হুক্কা, প্রভৃতি ধূমপানের সামগ্রী ভেঙ্গে ফেলল। তামাক-সেবন সম্পর্কিত চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন শাহ নাসের-উদ-দীন। এজন্যে রাজপ্রাসাদে তার স্ত্রী, পরিচারিকা ও ভৃত্যরা তাকে একঘরে করে। এ ঘটনা বৃটিশদের জন্যে কেবল ব্যর্থতাই ছিল না, তা' ছিল তাদের জন্যে শিক্ষনীয়ও বটে। তারা উপলব্ধি করল যে, ইরানে ইসলামই তাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জনগণ রাজদরবারে নয়, ধর্মীয় নেতাদের ঘোষণার মধ্যেই খুঁজে পেত ইসলামের মর্মবাণী।

ইসলাম এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বৃটিশদের আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে সংবিধান আন্দোলন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দই এ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বৃটিশ উপনিবেশবাদ নির্মূল ও আভ্যন্তরীণ একনায়কত্ব উচ্ছেদ করাই ছিল নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য। এ আন্দোলন দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগে বৃটিশরা আভ্যন্তরীণ চরদের মাধ্যমে আন্দোলনকে বিপথে চালিত করে।

www.pathagar.com

তারা ফাঁকা কথার তুবড়ি ছুটিয়ে শেখ ফজলুল্লাহ নূরীকে সংবিধান বিরোধিতার জন্যে দায়ী করে। আর এভাবেই আন্দোলনকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার পটভূমি রচিত হয়। সংবিধান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও উদ্যোক্তা শেখ ফজলুল্লাহ নূরী স্বীয় বিচক্ষণতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ আন্দোলন হুমকির সম্মুখীন। বৃটিশরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংবিধান খণ্ডিত করতে চেয়েছিল। তারা কিছু ইসলামী রং মাখিয়ে এ সংবিধানকে ইসলামী সংবিধান হিসেবে অভিহিত করে জনগণকে প্রবঞ্চিত করতে মতলব এঁটেছিল। এ কারণেই নূরী এ ধরনের একটি সংবিধানের ঘোর আপত্তি করেন এবং পাশ্চাত্য নয়, কোরানের ভিত্তিতে প্রণীত সংবিধান বিশিষ্ট একটি ইসলামী সরকার গঠনের আহবান জানান। তার কথায় বৃটিশদের পরিকল্পিত ঐ সংবিধান ছিল "বৃটিশদের ভাবধারাপুষ্ট।" প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি ঐ সংবিধানের বিরোধিতা করলেও বৃটিশরা অজুহাত তুলল যে, তিনি সংবিধানের বিরোধী এবং এ অজুহাতেই সংবিধানের ভুয়া প্রবক্তরা শেখ ফজলুল্লাহ নূরীকে ফাঁসিতে ঝোলাল; নিজেরাই প্রণয়ন করল এক সংবিধান, যা কার্যতঃ পাহলভী রাজংশের কৃষ্ণ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করল। এ সংবিধান প্রণেতারাই বিভিন্ন মন্ত্রীত্বের গদি দখল করল।

অবশেষে, বৃটিশরা এ আন্দোলন বিপথে চালিত করতে এবং ইরানে নিজেদের ঈপ্সিত শাসন ব্যবস্থা কায়েমে সফল হল। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবেই বুঝল যে ইরানে তারা ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মুখোমুখী হয়েছে, লিপ্ত হয়েছে সংঘাতে।

১৯২০ সাল নাগাদ ইরাকে ইসলামী আন্দোলনও ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বৃটিশদের আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। ঐ আন্দোলনের ফলেই ইরাক থেকে বৃটিশ রাজশক্তিকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। মীর্জা মুহাম্মদ তাকি শিরাজী, আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আবুল কাসিম কাশানি ও তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মুস্তফা কাশানিসহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে এ সংগ্রামে বৃটিশরা আরেকবার ইসলামের ক্ষমতা ও জনগণের ওপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবের ব্যাপকতা উপলব্ধি করল।

১৯৫২-৫৩'তে তেল শিল্প জাতীয়করণের সময়ও বৃটিশরা দেখল যে, তারা আবার ঐ একই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, যারা ইরাকে বৃটিশদের পরাজিত করেছেন। আন্দোলন চলাকালে অন্যান্য শক্তিও সক্রিয় সহযোগিতা করেছে, তাহলেও বৃটিশরা জানত, উদ্দীপনাসঞ্চারী যে মৌল উপাদান জনগণকে রাস্তায় আন্দোলনে শামিল করেছে এবং আন্দোলনকে জোরদার করেছে, তা হচ্ছে সেই একই ধর্মীয় নেতা। তিনি অন্য কেউ নন। তিনি হচ্ছেন আয়াতুল্লাহ আবুল কাসিম কাশানি। যৌবনে কারাগার ও নির্বাসন জীবন যাপনকারী এই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার শরীর অত্যাচারের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংবিধান

www.pathagar.com

আন্দোলন ও শেখ ফজলুল্লাহ নূরীর বিরুদ্ধে বৃটিশরা যেমন করেছিল, এবারেও উপনিবেশবাদীরা সেভাবেই এ আন্দোলনকে মূল পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে তারা আমেরিকার নেতৃত্বে নয়া উপনিবেশবাদের পথ প্রশস্ত করে।

বিগত শতাব্দীতে যা যা ঘটেছে, সেগুলো সযত্ন-সচেতন বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। প্রথমতঃ ইরানের (ইরাকেরও) জনগণ অন্ততঃ একশ' বছর যাবৎ লড়াই করছেন একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। এসব সংগ্রামে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দই ছিলেন নেতা ও অগ্রগামী। দ্বিতীয়তঃ মীর্জা শিরাজীর সৃষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়ে উপনিবেশবাদীরা উপলব্ধি করতে পারল যে, জনতা কিসের জন্যে, কি মতবাদে দীক্ষিত হয়ে লড়াই করে। তাই উপনিবেশবাদীরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের ওপর পাহলভী রাজবংশ চাপিয়ে ও তা টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তারা মীর্জা শিরাজী, শেখ ফজলুল্লাহ নূরী ও আয়াতুল্লাহ কাশানির মত সচেতন ও প্রকৃত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

এ কারণে, তামাক সম্পর্কিত ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ে উপনিবেশবাদীরা এসব সংগ্রামের প্রধান মূল ধ্বংসের চেষ্টা গুরুত্ব সহকারে শুরু করল। তারা উপলব্ধি করল যে, সরাসরি ইসলামের সাথে সংঘাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা সাব্যস্ত করল, এমন একটি পন্থা উদ্ভাবন করা উচিত, যে পন্থায় ইসলামের বিরোধিতা করতে হয় না, বরং ইসলামের অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করা যায় এবং একই সাথে ইসলামী চিন্তাধারা উৎপাটন করা সম্ভব হয়।

ইরানে ইসলাম উৎখাতের চর পাহলভী রাজবংশ

ইরানে বৃটিশরা ইসলাম উৎখাতের দায়িত্ব দেয় রেজা খানকে। পরে, আমেরিকানরা রেজা খানের কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজের জন্যে পাহলভী রাজবংশকে আবার ক্ষমতাসীন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর রাজবংশ চালাতে থাকে ইসলাম নির্মূলের কাজ। এ ধূর্ত কাজ পাহলভী রাজবংশ এত দক্ষতার সাথে চালাত যে, মধ্যপ্রাচ্যে উপনিবেশবাদের চর হিসেবে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীকে বেছে নেয় এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর এলাকা নিরুপদ্রব রাখার দায়িত্ব দেয় মুহাম্মদ রেজা পাহলভীর ওপর। পাশ্চাত্য জগতের জন্যে পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। আমেরিকান উপনিবেশবাদীরা তাকে ("পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পাহারাদার" হিসেবে অভিহিত হত) ইসরাইলের

www.pathagar.com

সাথে সহযোগিতা করার এবং এ অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গকে মদদ যোগাতে বলে।

নয়া-উপনিবেশবাদ সকল মুসলিম দেশে ইসলামী সংস্কৃতি নির্মূল করা এবং ধর্মীয় হঠকারিতার দিকে মুসলমানদের ঠেলে দেয়ার জন্যে সকল প্রচেষ্টা চালায়। রেজা খান পাহলভী ইসলাম ধ্বংসের এ পটভূমি তৈরী করে। রেজা খান পশ্চিমা সংস্কৃতি লালন-পালন ও বিকাশ সাধন, ইসলামী চিন্তাধারা নিরুৎসাহিতকরণ এবং নারীদের বিবস্ত্রকরণ ও একই ধরনের পোশাক প্রবর্তন করার কাজ সোৎসাহে ও জোরেসোরে চালায়। সে ইরান থেকে ইসলাম বিতাড়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ইরানে পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার ক্ষেত্রে শাহ নাসের-উদ-দীন কিছু ব্যবস্থা নিলেও, রেজা খান এ কাজটি যতটা গুরুত্বের ও ধৈর্যের সাথে চালিয়েছিল, ততটা পারেনি।

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ধারা বিকশিত করা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে ইরানী যুবকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে প্রেরণের ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের লক্ষ্য ছিল একদল ইরানীর 'মস্তিষ্ক ধোলাই' করা ও "ইসলাম হটাও"-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োজিত করা। এই যুবকরা ইরানী ও মুসলমান। নিজেদের পারিবারিক বন্ধনসূত্র ও সম্পর্কের এ সুবিধাহেতু তাদের পক্ষে ইরানী জনগণের কাছে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালা ইসলাম উপস্থাপন সহজ ছিল। সম্ভব ছিল 'ইসলাম দিয়ে' ইসলামকে মোকাবেলা করার। এই গোষ্ঠীটি নিজেদের দক্ষতা ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আরো ব্যাপকভাবে নয়া-উপনিবেশবাদীদের কাজ করতে পারে। এ সুবিধার ফলেই জনগণের ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে এরা। এটা উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য আরো সহজে ও আরো দ্রুত হাসিলে সাহায্য করে। উপনিবেশবাদীরা প্রকৃত ইসলামের পরিবর্তে "ঔপনিবেশিক" ইসলাম চাপিয়ে দিচ্ছিল। নয়া-উপনিবেশবাদীরা নিজেদের ভাড়াটেদের অকাতর সহায়তা-সহযোগিতায় এমন এক সরকারকে ক্ষমতায় বসাল, যে সরকার নয়া-উপনিবেশবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী সকলকে সব সুযোগ-সুবিধা দেবে।

নয়া উপনিবেশবাদীদের এ কার্যক্রম কেবল ইরানেই সীমিত ছিল না। এ কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের সকল ইসলামী ও অন্যান্য উপনিবেশে চালানো হল। তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। ঔপনিবেশিক ভাড়াটেদের দেয়া সকল সাহায্যের বদৌলতে কামাল আতাতুর্ক স্বদেশে জনগণের জীবনে ও ইসলামী সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনয়নে সফল হন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, তুর্কী লেখন পদ্ধতিকে ল্যাটিন পদ্ধতিতে রূপান্তরকরণ।

ধর্ম-বিরোধী কাজ-কর্মের জন্যে রেজা খানের পক্ষে বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুরা রেজা খানের পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুত্র মুহাম্মদ

www.pathagar.com

রেজাকে ক্ষমতায় বসালে। উপনিবেশবাদীদের ইচ্ছা বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রাখার মত করে তাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তারা মুহাম্মদ রেজাকে "ইসলাম হটাও"-এর দায়িত্ব দেয়। সে ছিল উপনিবেশবাদীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নতজানু, দুর্বলচেতা ব্যক্তিত্ব। তবে শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য সময় যাবৎ নিজের দুর্বল অবস্থানহেতু সে প্রভুদের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি।

১৩৩২-এর ২৮শে মোরদাদে (১৯৫৩) অভ্যুত্থানের পরে মুহাম্মদ রেজা পাহলভী ইরানে ফিরে আসে, আমেরিকার সাহায্যে সংহত করে ক্ষমতা। এরপরই "ইসলাম হটাও"-এর কাজ নতুন গতি পায়। ১৬৬১ সাল পর্যন্ত সে নিজের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ঐ সময়ে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল মুহাম্মদ রেজার কাছে এক বিরাট বাধা। এ আন্দোলন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করে। জনগণের ওপর মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজারদির প্রভাব ছিল ব্যাপক। এ প্রভাব এতই ব্যাপক ছিল যে, শাহ কখনোই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই চালাতে সাহস করেনি। সে নিজে স্বরচিত বই "শ্বেত বিপ্লব"-এর ভূমিকায় এ কথা স্বীকার করেছে। আয়াতুল্লাহ বুরুজারদির ইন্তেকালের কয়েক বছর পরে লেখা এ বইটিতে ভূমি সংস্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য ছিল সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা ও পুঁজিপতিদের জমি দিয়ে এমনই এক আধুনিক সামন্ততন্ত্র গড়ে তোলা, যা হবে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর। এ ভূমি সংস্কার কর্মসূচী দেশের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। ক্ষমতাচ্যুত শাহ স্বরচিত বইটিতে উল্লেখ করেছে যে, মজলিসে বিলটি কিভাবে গৃহীত হয়। সে লিখেছে, ১৯৫৯ সালের ভূমি সংস্কার আইন পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আইনে রূপান্তরিত করা হয়। সে (শাহ) বলেছে, মজলিস আইনটি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, অধিকাংশ মজলিস-সদস্য ছিল ভূস্বামী ও পুঁজিপতি। সে মজলিসের অসম্মতির আরেকটি কারণ হিসেবে এক "দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষের" হস্তক্ষেপকে দোষারোপ করে, সে "কর্তৃপক্ষ" দুনিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে ছিল অচেতন। সে আরো বলেছে, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের নিয়ে গঠিত মজলিস ভূমি সংস্কারকে পুরোপুরি নিরর্থক ও অকার্যকর ব্যাপারে পরিণত করে। শাহ "দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষ" বলতে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদিকে বোঝায়। শাহ ও তার ঔপনিবেশিক প্রভুরা যাকে "সামাজিক প্রগতি" বলত, আয়াতুল্লাহ বুরুজারদি ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। তাই আয়াতুল্লাহ বুরুজারদিকে দোষারোপ করা শাহের পক্ষে স্বাভাবিক। আয়াতুল্লাহ বুরুজারদি শাহের "সামাজিক প্রগতির" বিরোধিতা করতেন, কারণ দেশের কৃষিতে এ সংস্কারের ফলাফল কি হবে, সেটা তিনি আগেই ধারণা করেছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে ও প্রভুদের খুশী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুহাম্মদ রেজা ২৮শে মোরদাদের অভ্যুত্থানের পরে বিরোধী মজলিস বাতিল করে।

www.pathagar.com

শাহের ১৯৭৯ সালে প্রদত্ত এক ভাষণ থেকে জানা যায়, নিজের ঘৃণিত শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যে শেষ চেষ্টা করার সময়, বৃহৎ শক্তিবর্গের দূতাবাস-গুলো মজলিস-সদস্যদের নামের তালিকা দিয়েছিল শাহকে। নির্বাচনে যাতে তালিকাভুক্ত নামগুলো নির্বাচিত বলে বিবেচিত ও ঘোষিত হয়, সেজন্যেই এ তালিকা প্রদান।

তাই, ১৯৫৯ সালে মজলিস ভূমি সংস্কার বিলের বিরোধিতা করে সে বিলকে পরিবর্তন করেছিল বলে শাহের দাবী তাহা মিথ্যা। "শ্বেত বিপ্লব" বইতে অন্যান্য কথার মতই এটা। ভূমি সংস্কারের নামে ১৯৫৯ সালে যে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ সে করতে যাচ্ছিল জনগণের উপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবেই সেটা ব্যর্থ হয়। এ প্রভাবই শাহের পরিকল্পনায় বাধা দেয়।

১৯৬১ সালে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদির ইন্তেকালের পরে শাহ নাজাফে আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মুহসিনের কাছে শোকবাণী পাঠায়। বর্তমানে ধর্মীয় নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল নাজাফে, অর্থাৎ ইরানের বাইরে, এবং জনগণের উচিত নয় ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বকে মেনে চলা। একথা প্রকারান্তরে বোঝানোর জন্যেই শাহ এটা করে। যে শাহ না আয়াতুল্লাহ হাকিম না ইরানের কোন ধর্মীয় নেতৃত্বকে বিশ্বাস করত। তার এ রাজনৈতিক চালবাজিই প্রমাণ করে যে, নিজেদের অশুভ স্বার্থ চরিতার্থ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব অবসানে ঔপনিবেশিক প্রভুরা কতই না তৎপর ছিল।

সূচনাস্থল

আয়াতুল্লাহ বুরুজারদির ইন্তেকালের ফলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবের অবসান হয়েছে বলে কল্পনা করে শাহর ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদের পুতুল শাহকে আমেরিকার আধিপত্যাধীন অন্যান্য দেশে আংশিক বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়িত হতে চলেছে, এরকম পূর্ব প্রণীত পরিকল্পনা রূপায়ণে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেয়। যদিও শাহ নিজেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, ধর্ম ছাড়া অন্য কোন শক্তি নেই তাকে (শাহকে) বাধা দিতে পারে, তবু সে জনগণের ওপর ইরানের উলামাদের প্রভাবের ব্যাপারটি স্বীকার করত না। শাহ অনতিবিলম্বে নিজের মহাপরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু করে; আরম্ভ করে ইরানের "আধুনিকীকরণ।"

আমেরিকার প্রথম পরীক্ষামূলক চেষ্টা প্রাদেশিক ও জিলা পরিষদ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রভাবের ব্যাপারটিতে তাদের মূল্যায়ন যে ভুল ছিল এটা ধরা পড়ে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ কোমের নেতারা প্রস্তাবিত বিষয়ের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং সরকার বিষয়টি বর্জন করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

১৯৬১ সালের এ বিরোধিতার নেতৃত্ব দেন ইমাম খোমেনী। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী, ধার্মিক এবং চমৎকার গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবেই চিনে আসছিলেন।

এ আন্দোলন শাহের সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের সূচনাস্থল না হলেও, তা ছিল বিগত শতাব্দীতে সূচীত লড়াইয়েরই অব্যাহত রূপ। ১৯৬১ সাল শাহের সরকারের বিরুদ্ধে ইমামের অব্যাহত সংগ্রামের সূচনাস্থল হিসেবে অভিহিত হওয়া উচিত। আমাদের জানা উচিত যে, ইমাম যখন বিখ্যাত পুস্তক কাশফ-উল-আসরার রচনা করেন, সেই রেজা খানের শাসনকাল থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর সংগ্রাম। এ বইতে তিনি রেজা খান ও উপনিবেশবাদীদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সেইসব ধর্মীয় নেতার একজন, যারা সেই শাসক-গোষ্ঠীর আমলে সর্বাপেক্ষা হিংসাত্মক নিষ্ঠুরতার শিকার হন। যাদের সাহায্যে ভবিষ্যত আন্দোলন গড়ে তুলবেন, সেই মেধাবী ও জঙ্গী শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ইমাম এবং তিনি তা করেছেন রেজা খান ও তার (রেজা খানের) পুত্রের নির্যাতন-কারী শাসনকালে।

গুটিকয় ধর্মীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপরীত অবস্থানের শুরু থেকেই ইমাম খোমেনী কতিপয় ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে কোন প্রকার সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতার দ্বারা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেন, শুরু করেন শাহী শাসনের বিরোধিতা। ইরানী জনগণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বহু বিপ্লবী মুসলমান তাঁকে এক মহান, সচেতন ও সাহসী ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকার করে। ১৯৬১-৬২ তে এক তেজস্বী ভাষায় রচিত বিবৃতির পর থেকে তিনি ভাষণ দেয়া শুরু করেন। এসব ভাষণে শাহ শাসনের চরিত্র এবং ইসলাম ধ্বংস ও ইরানসহ মুসলিম দেশগুলোর ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে আমেরিকা ও ইসরাইলের চক্রান্ত তুলে ধরেন। আমেরিকা বুঝলো যে, তিনি তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের পথে এক বিরাট বাধা। তাই ফয়জিয়ে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে আশুরাতে ১৯৬১-এর ১৫ই খোরদাদে ইমাম খোমেনীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদানের পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শাহ তাঁকে কারাবন্দী করেন। এ ভাষণে ইমাম খোমেনী বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে ইরানের জনগণ ও সারা দুনিয়ার মুসলমানের প্রতি আহবান জানান। আজ পর্যন্ত আমেরিক ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে এটাই ইসলামী দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

৫ই জুনের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৩ সালের ৫ই জুন সকালে ইমাম খোমেনীর গ্রেফতার ও তেহরানে তাকে কারান্তরীণ করার পরে ইরানের, বিশেষতঃ তেহরান, কোম, মাশাহাদ, শিরাজ, ইস্পাহান ও তাব্রিজের মত বড়-বড় নগরীর জনগণ নিজেদের নেতার সমর্থনে ও শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শাহের সরকার সামরিক আইন জারি করে, নির্মমভাবে হত্যা করে ১৫ হাজার মানুষ এবং এভাবেই সাময়িককালের জন্যে নিভিয়ে দেয় প্রতিবাদের এই শিখা। ঐ দিনে জ্বলে ওঠা বিদ্রোহের আগুন নিপীড়ন-নির্যাতনের ভস্মতলে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে এবং অবশেষে, ১৫ বছর পরে অত্যাচার- অনাচার-অবিচারের শাহী বালাখান পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

ইরানী ইসলামী জনতার মধ্যে এক নয়া আন্দোলনের সূচনাস্থল ছিল ১৯৬৩'র ৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থান। এটাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য। ১৯৬৩-পূর্ব ঘটনাবলী, বিশেষ করে, ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগস্টের অভ্যুত্থান, তেল জাতীয়করণ আন্দোলনের অ-ধর্মীয় জঙ্গী কর্মীদের বিচ্যুতি, পরবর্তীতে নাভভাব সাফাভী ও ফেদাইন-ই ইসলাম সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড এবং শাহ শাসন উৎখাতে গঠিত ধর্মীয় নেতৃত্বের নির্মূলীকরণ, এ সবই ধর্মানুসারী মহলে শাহ সম্পর্কে হতাশা সৃষ্টি করে। অপরদিকে, জনগণের মধ্যে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মনোভাব জাগিয়ে তুলতে শাহ শাসনের অক্লান্ত ও ব্যাপক প্রচেষ্টা, সমাজে দুর্নীতি, ইত্যাদি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশকে গুরুতরভাবে বিঘ্নিত করে। দু'বছরব্যাপী অব্যাহত সংগ্রামের পরে এবং ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বাধীনে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আহবান জনোনোর ফলে ৫ই জুনের গণজাগরণ ছিল এমনই এক স্ফুলিঙ্গ, যা ইরানে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মনঃলোক আলোকিত করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামী চেতনা পুনরুজ্জীবনেও এ ঘটনার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

৫ই জুনের গণজাগরণকে ইরানের সমগ্র ইসলামী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং এ দিনটিকে কেবল হত্যাযজ্ঞের দিবস হিসাবে বিবেচনা করলে, তা হবে নিছক ভাসাভাসাভাবে চিন্তা করা। একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরানের সমগ্র ইতিহাসে যে সংগ্রামের অধ্যায় রয়েছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থানকে বিবেচনা করাটাও মূঢ়তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

ইরানের যে মুসলিম জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করেছেন একটি ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে, সে আদর্শ-অন্বেষী জনগণের চেতনা ও অনুপ্রেরণারই অভিব্যক্তি হচ্ছে ৫ই জুনের গণ-উত্থান। এ গণ-অভ্যুদয় ছিল ইমাম খোমেনীর ইসলামী কানুন কায়েমের জঙ্গী আহবানে সাড়া দিয়ে উত্থিত নব বংশধরদের কাছে অতীত অভিজ্ঞতামালা হস্তান্তরের সেতুবন্ধ। এই ৫ই জুনের অভ্যুত্থানই ইরানের নও মুসলিম বংশধরদের ধর্ম-রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিতে উৎসাহিত করে এবং এ সময় থেকেই রাজতান্ত্রিক শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে কিছু জঙ্গী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

এসব দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা ইসলামী ও ইসলামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অনুগত হলো "ইউনাইটেড ইসলামিক গ্রুপস।" এ গ্রুপটি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং ইমাম খোমেনীকে প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করত। ফেদাইন-ই-ইসলাম ও অন্যদের অবশিষ্টাংশ নিয়ে এ দল গঠিত হয়। বর্তমানে যারা ইমাম খোমেনীর সহচর, বিপ্লব পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যারা ইমাম খোমেনী নিযুক্ত ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের মূল কেন্দ্র গঠন করেছেন, তারাই ছিলেন ইউনাইটেড ইসলামিক গ্রুপসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ দলের নেয়া তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৬৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী শাহর প্রধানমন্ত্রী হাসান আলী মনসুরকে খুন। মনসুর ছিল তাদেরই একজন, যারা শাহ ও তার প্রভু আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করেছিল এবং শাহর কারাগারে প্রায় আট মাস অন্তরীণ রাখার পরে ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে ইমামকে বিদেশে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল।

ইরানে বি-ইসলামীকরণের চরমসীমা

১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সালের ঘটনাবলী শাহর শাসনকে ব্যতিব্যস্ত রাখলেও এই শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ঔপনিবেশিক কাজ-কর্ম ভালভাবেই চালিয়ে যায়। ইরানী জনগণের ইসলামী ও জাতীয় সত্তার পরিবর্তন করে তদস্থলে পশ্চিমা পরিচয় সেঁটে দেয়াই ছিল উপনিবেশবাদীদের পরিকল্পনা। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ষ বর্ষ যাবৎ ইসলামী সংস্কৃতি ইরানীদের জাতীয় কৃষ্টির সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, এ দু'টি অবিচ্ছাজ্য। ইরানে ইসলামের আগমনের পর থেকে ইরানী সংস্কৃতি সর্বদাই ইসলামী সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই উপনিবেশীকরণ উদ্যোগ সকল ক্ষমতা লাগিয়েছে ইরানে বি-ইসলামীকরণের জন্যে।

ইমাম খোমেনীকে তুরস্কে নির্বাসন দেয়ার পরে শাহ সরকার নিজের ঔপনিবেশিক দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন করার চমৎকার সুযোগ পায়। ইরানে

www.pathagar.com

আমেরিকান উপদেষ্টাদের সকল বিচারের এখতিয়ারের বাইরে রাখার প্রস্তাব করে মজলিসে যে বিল উত্থাপিত হয় তার বিরোধিতা করার কারণেই ইমাম খোমেনীর নির্বাসন। কোমে স্বগৃহে ১৯৬৪ সালের ২৬শে অক্টোবর প্রদত্ত ভাষণে ইমাম খোমেনী ঘোষণা করেন, ইরানের জনগণ যে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করে, সে আর কেউ নয়, সে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

ইমাম খোমেনী এ ভাষণে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনের কঠোর সমালোচনা এবং ইরানসহ অন্যান্য ইসলামী দেশ লুণ্ঠনে ঐ সব দেশের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া ছাড়াও ইসলামী দেশসমূহের প্রধানদের সতর্ক করে দেন যে, ইসলাম বিপন্ন এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ ইসলাম ধ্বংস করেই নিজেদের লক্ষ্য হাসিল করতে চায়। এ বক্তব্যই তার এই ভাষণের গুরুত্ব। এসব ভাষণে ইমাম খোমেনী সুস্পষ্ট ভাষায়, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের গুরুত্ব তুলে ধরতেন এবং বলতেনঃ

"যুক্তরাষ্ট্র সরকার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব নস্যাৎ করার মাধ্যমে নিজের পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে চায়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র জানে যে, যতদিন ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব থাকবে, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।"

ইমাম খোমেনীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে এবং বহু জঙ্গী ধর্মীয় নেতা, ছাত্র ও অন্যান্য জঙ্গী শ্রেণীকে কারান্তরীণ ও হত্যা করে শাসকগোষ্ঠী এক নিপীড়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে। শাসকগোষ্ঠী ইসলামের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রচারণার পটভূমি তৈরী করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল প্রকৃত ইসলামী শক্তিগুলোর জন্যে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মধ্যে টিকে থাকার অধ্যায়। কাজার রাজবংশের সময় থেকে ইরানে যে "বি-ইসলামীকরণ" ইসলাম-হটাও প্রক্রিয়া চলছিল, ঐ বছর ক'টি ছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরম পর্যায়।

ইরানে "বি-ইসলামীকরণ"-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনার জন্যে একটি পৃথক রচনার প্রয়োজন। তবে এ প্রেক্ষিতে ইরানে যেসব কর্মসূচী চালিত হয়, তার কয়েকটি প্রধান কর্মসূচী উল্লেখ করারও দরকার রয়েছে।

দরবারের ইসলাম

নয়া উপনিবেশবাদীরা পুরোপুরি সচেতন ছিল যে, মুসলিম দেশসমূহে, বিশেষতঃ ইরানে খোলাখুলিভাবে ইসলামকে 'চ্যালেঞ্জ' করাটা মারাত্মক ভুল হবে। এর ফলে সেটাই শক্তিশালী হবে, যেটাকে তারা দুর্বল করতে চেয়েছে। ইরান তথা মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণ গভীরভাবে ধার্মিক। তাই নয়া উপনিবেশ-বাদীরা কখনোই ইসলামকে সরাসরি অস্বীকার বা সমালোচনা করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেনি। বরং তারা ইসলামকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে, এ ধরনের ইসলামের ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের জন্যে চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল। তাদের ঈপ্সিত ধরনের ইসলামকে "দরবারের ইসলাম" হিসেবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ তাদের এ ধরনের ইসলাম জনগণের আদর্শগত নীতিমালা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা না করেই ইসলামী সংস্কৃতির বদলে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি কায়েমের পথ প্রশস্ত করবে এবং এভাবেই তারা কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে মুসলিম দেশসমূহের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিকৃত ধরনের ইসলামের প্রচার করে তারা মুসলিম দেশগুলোতে নিজেদের পদলেহী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে। তারা জানত যে, এসব দেশের রাষ্ট্রনায়করা নিজেদেরকে ইসলাম সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের ভান করতে পারলে তারা শাসন অব্যাহত রাখতে পারবে। পরিবর্তে ধর্মের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শিত হলে তাদের শাসন হবে দুর্বল।

এ কারণেই পাহলভী শাসকগোষ্ঠী বিপুল অর্থ ব্যয়ে পবিত্র কোরান প্রকাশের মাধ্যমে, মসজিদ নির্মাণ করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে ইসলাম প্রচার করত। এরই পাশাপাশি তারা ইসলামের মৌল নীতিমালা ও প্রকৃত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালাত। ইসলামের বিকৃতিতে আপত্তি জ্ঞাপনকারী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ধর্মতাত্ত্বিকদের তারা কারাবন্দী করত, অত্যাচার চালাত, দমন করত প্রকৃত ইসলাম বিকাশে আকাঙ্খী প্রত্যেককে। নয়া উপনিবেশবাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত সকলেই জানেন যে, এসব কাজ ছিল জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। জনসাধারাণ এসব প্রচারণা সম্পর্কে পুরোপুরি অচেতন ছিল। তৃতীয়তঃ নয়া উপনিবেশবাদী সরকারসমূহ ক্ষমতায় থাকলে ঐসব সরকার নিপীড়িতদের হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। উপনিবেশবাদীরা জানত যে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে যদি জেগে ওঠে, তাহলে তা' নিঃসন্দেহে পৃথিবীর নিপীড়িত জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্দীপিত করবে। এটা বিশ্বের সকল নিপীড়কের জন্যেই গুরুতর হুমকি। এ নিপীড়করা ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ফলাফল দেখছে। চতুর্থতঃ প্রকৃত ইসলামের বদলে "দরবারের ইসলামকে" সামনে তুলে ধরার সুবিধা হল, যেসব লোকেরা একটি আদর্শ অন্বেষণ করছেন, তারা "দরবারের ইসলামের" মধ্যে সে ধরনের আদর্শ খুঁজে পাবেন না এবং অবশেষে এ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, তারা মনে করবেন যে, কোন ধর্মই মানবজাতির জন্যে এ বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিপরীতক্রমে, প্রকৃত ইসলামের সাথে পরিচিত হলে একজন ব্যক্তি বিশ্বকে অনুধাবন করতে পারে, বিমূর্ত থেকে পারে নিজেকে মুক্ত করতে এবং নিপীড়ন, অবিচার, অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেকে এক প্রতিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত

www.pathagar.com

করতে পারে। "দরবারের ইসলামকে" তুলে ধরার মাধ্যমে অর্জিত অন্যতম সুবিধা হচ্ছে এসব ব্যক্তিবর্গের বিচ্যুতি। এসব ব্যক্তিই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সম্ভাব্য কর্মী হতে পারত। বিচ্যুৎ আদর্শসমূহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি অথবা এক নয়া আদর্শ সৃষ্টির প্রাথমিক কাজের প্রস্তুতিও "দরবারের ইসলামের" অন্যতম সুবিধা।

পাশ্চাত্যে নিহিলিজম বা নৈরাজ্যবাদের মত চিন্তাধারা ও "হিপ্পিদের" মত ব্যাপারগুলো ঘটেছে, সেখানে ধর্মীয় শূন্যতার কারণে। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশসমূহে এ ধরনের শূন্যতাই সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে, যেহেতু খৃষ্টান ধর্মের ইতিমধ্যেই বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাই পাশ্চাত্যে শাসকদের জন্যে নয়া ধর্ম উদ্ভাবনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু "দরবারের ইসলাম" সৃষ্টি না করা পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে এরকম লক্ষ্য হাসিল করা যাবে না।

দরবারের ইসলামের একদল প্রবক্তা পশ্চিমা শিক্ষিত। তারা প্রতিটি বাক্যে অন্ততঃ একটি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে। তাদের চিন্তাধারা ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় দূষিত হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করত যে, পশ্চিমা সংস্কৃতিকে কোলে টেনে নিতে পারলেই ইরান সভ্য দেশে পরিণত হবে। তবে এটা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সকলের ধারণা নয়। এদের কেউ কেউ নিজেদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী না হারিয়েই বিদেশ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে ইরানে ফিরেছে এবং কোরানের নির্দেশ মত ইসলামের সেবায় সে জ্ঞান কাজে লাগিয়েছে। কোরানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ যারা দুনিয়ার কাছ থেকে শেখে, তারপর সর্বোত্তম বিষয়টি অনুসরণ করে, তারা আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত এবং তারাই বোঝার মত মানুষ (৩৯ঃ১৮)। তবে অধিকাংশই ছিল এমন লোক, যাদের কাজ ছিল নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করার সাথে সাথে ভুয়া ইসলামী কথা-বার্তা দিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি বিকশিত করা এবং "দরবারের ইসলামের" যথার্থতা বৈজ্ঞানিকভাবে তুলে ধরা।

মুসলিম দেশসমূহ তথা ইরানের জনগণের সংস্কৃতির ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুতর আঘাত হলো এটাই যে, ইসলাম সম্পর্কে আলোচনাকারী অধিকাংশ লোক ইউরোপ প্রত্যাগতদের অনুকরণ এবং পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ অনুসারে নিজেদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করত। এ পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিগত হীনমন্যতাবোধ জন্মাল এবং তা ক্রমে ক্রমে শিকড় বিস্তৃত করল। এটা সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপারে দাঁড়াল যে, কোন ইসলামী চিন্তা পাশ্চাত্য উদ্ভূত ধারণা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এই বুদ্ধিবৃত্তিগত হীনমন্যতা ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সেইসব লোকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা ইসলামের ভুয়া মোড়কের আড়ালে পশ্চিমা সংস্কৃতি বিকশিত এবং মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চাইত।

www.pathagar.com

ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য এই সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতারই একটি অশুভ পরিণতি।

দরবারের ইসলামের আরেক দল প্রবক্তা হচ্ছে সেইসব ইসলামবিদরা, যাদের নামের পেছনে থাকত হকচকিয়ে দেয়ার মত সব খেতাব। এরা উপনিবেশবাদীদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রণীত ইসলাম উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামী দেশসমূহে সফর করত। মুসলমান বিদ্বজ্জনদের রচনার অংশ বিশেষের অনুবাদের সারসংক্ষেপ তৈরী করত, নিজেদের পছন্দমাফিক এগুলো উদ্ধৃত করত, এগুলোতে রং মাখাত, এরপর সুদৃশ্য মোড়কে চমৎকার সংস্করণ হিসেবে প্রকাশ করত। এরপর এগুলো ব্রিফকেসে বন্দী করে বিভিন্ন মুসলিম দেশে নেয়া হত এবং সে সব দেশের পর-নির্ভরশীল শাসকগোষ্ঠীর আয়োজিত সম্মেলনগুলোতে ঐসব পুস্তক পেশ করা হত। এসব শাসকগোষ্ঠীর তথ্য মাধ্যমগুলো ঐ ব্যক্তিদের ও তাদের "গবেষণা কর্মগুলোকে" এত প্রচার করত যে, কেবল জনগণই নয়, তথাকথিত "গবেষণায়" সংশ্লিষ্ট সকলে ঐ কথা-বার্তা ও বক্তব্যে বিশ্বাস করা শুরু করত। ফলশ্রুতিতে, প্রকৃত ইসলাম বিশারদরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং নিজেদের গবেষণা ও অধ্যয়নের সুফল জনগণের কাছে উপস্থাপনের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন।

এমতাবস্থা অন্য কোন মুসলিম দেশের চেয়ে ইরানে বেশী পরিমাণে দেখা যেত। রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী এ কাজে এতই গুরুত্ব দিত যে, অর্থ যোগানোর জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হত। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অসংখ্য সংগঠনও স্থাপন করা হয়েছিল। বি-ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে এ চক্রান্ত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এ কথা বিবেচনা করেই পাহলভী শাসকগোষ্ঠী সিংহাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে এ কাজে বিশেষ মনযোগ দিত। এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন ও এ বিষয়টি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

এ কাজে শাসকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত প্রধান অনুচর ছিল তথাকথিত পশ্চিমা ইসলাম তত্ত্ববিদরা ও পশ্চিমা মতানুসারী বুদ্ধিজীবীরা। এরা পরস্পরের সাথে মিলে ইরানের জনগণকে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা চালায়।

সরকারী সাম্যবাদ

ইসলাম নির্মূল করার জন্যে আঁটা হয়েছিল এ চক্রান্ত। সমাজ থেকে ইসলাম দূর হলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের মাধ্যমের কথা চিন্তা করতে ব্যর্থ হয়নি এ চক্রান্তের হোতারা। তারা ভালাভাবেই জানত যে, পর্যাপ্ত জ্ঞানহীন জনসাধারণের জন্যে "রাজকীয়" ইসলাম একটি উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে। তাই তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে "সরকারী সাম্যবাদসহ" অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

পাহলভী শাসকগোষ্ঠী হয় দরবারের সাহায্যে, নয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক দর্শন ও শিল্প সংগঠনকে একটি প্রগতিশীল রংয়ের প্রলেপ দেয়া হয়। "বুদ্ধিজীবী" সংগঠনগুলোর প্রতি ইরানী সমাজের একটি শ্রেণীর আকর্ষণ এবং একই সাথে সরকার কর্তৃক সহ্য করা এসব সংগঠনের সমালোচনার ব্যাপারটি ছিল বুদ্ধিবৃত্তির দিকে অসন্তুষ্ট বহু লোকের সন্তুষ্টির জন্যে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর কাছে এক বিরাট সাহায্য। এসব লোক নিজেদেরকে কবিতা, ছবি আঁকা ও নাট্যাভিনয়ে ব্যস্ত রাখত। মাঝে মাঝে এসব কাজ-কর্মের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর সামান্য সমালোচনা করা হত। কিন্তু এসব সমালোচনা ক্রমান্বয়ে অভিজাততন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের ফাঁদে আটকে গেল। কখনো তা হল সচেতন, কখনো বা অচেতনভাবে। প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশীকরণ ও শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল এসব লোককে এমন কিছুতে নিয়োজিত রাখা, যা সরকারের নীতির সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ হয় না। এভাবেই সমালোচনা সত্ত্বেও এগুলো "সেফটি ভাল্" বা নিরাপদ নির্গমন দ্বার হিসাবে কাজ করত। শাসকগোষ্ঠী যেহেতু জানত যে এ সকল সমালোচক শক্তি শেষাবধি অভিজাততন্ত্রের পাঁকেই নিমগ্ন হবে এবং একদিন এরাই উপনিবেশবাদীদের অপরাধের পক্ষে ছাফাই গাইবে যেহেতু তাদের সুযোগ-সুবিধাদির বন্টন, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে সে লক্ষ্যই ছিল কার্যকরী। এ কারণেই এসব গোষ্ঠীকে "ইরান-আমেরিকা" মিতির মত সমিতি ও সংঘকে নকল সমালোচনামূলক কবিতা আবৃত্তি করতে দেয়া হত। এখানে অনুষ্ঠিত নাটকগুলো পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর টেলিভিশনে দেখানো হত এবং চিত্রাংকনসমূহ পাঠানো হত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাসমূহে যেখানে এসব চিত্রাংকন সাধারণ পুরস্কার পেত।

ইসলামী মার্কসবাদী আন্দোলন গঠিত হয়েছে বলে ধারণা দেয়ার জন্যে এসব কাজ-কর্মের অনেকগুলোর গায়েই লাগানো হয়েছিল সাম্যবাদের রং।

এ ধরনের সাম্যবাদ রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। অথচ সাম্যবাদের সাথে রাজতন্ত্রের সংঘাত হবে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু এটা ছিল আরেকটা বানোয়াট ব্যাপার "সরকারী সাম্যবাদ"।

এক মিথ্যা জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আরেকটি মাধ্যম, যা উপনিবেশবাদীরা ইসলামীকরণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট শূণ্যতা পূরণের জন্যে চালু করেছে। একটি জাতির সামাজিক সংহতি এবং সে জাতির মূল্যই যদি জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায়, তাহলে ইসলাম কেবল তা মেনেই নেয় না, বরং তা সমর্থন করে এবং উৎসাহ যোগায়। ইসলাম

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ এবং নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন করে। বিশ্বে জাতীয়তাবাদের সমর্থকরা যা বলতে চেয়েছে তা অন্যদের জন্যে ক্ষতিকরভাবে কোন একটি জাতিকে বিশেষ মূল্য ও সমর্থন দেয়ারই নামান্তর। তারা একটি জাতির সামাজিক ঐক্য বোঝাননি। চলতি শতাব্দী জুড়ে উপনিবেশবাদীরা ইসলামী দেশগুলোতে এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নাধীন অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদকে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও মহান সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রচারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। উপনিবেশবাদীরা ইসলামের সাথে ইসলামী দেশগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করতে এটা করেছে। এটা হলে স্বাভাবিকভাবে মুসলমান দেশগুলোর পরস্পরের সাথে যোগসূত্রও নষ্ট হয়ে যাবে। উপনিবেশবাদীরা ভালভাবেই জানত যে, নীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদের চেয়ে ইসলামের স্থান অনেক ওপরে। এ নীতি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যবন্ধন গড়ে তুলতে পারে, এক ঐক্যবদ্ধ ইসলামী উম্মাহর জন্ম হতে পারে। ঐক্যবদ্ধ ইসলামী উম্মাহ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক ক্ষমতাধর হবে। উপনিবেশবাদের জন্যে গুরুতর বিপজ্জনক এ ধরনের ঐক্য রোধে জাতীয়তাবাদকে ইসলামের উর্ধে স্থান দেয়ার জন্যে এক ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়, দেখানো হয় এটি এক উত্তম নীতিমালা।

একটি মুসলমান জাতির মধ্যে বর্ণগত অহংবোধ জাগানোর মাধ্যমে জনগণের মনযোগ ইসলাম থেকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে। জাতীয়াবাদের চেতনা প্রচারের মাধমে উপনিবেশবাদীরা এই আরেকটি সুবিধাও পায়। যেসব জায়গায় তারা ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সেখানে তারা ইসলামের বদলে জাতীয়তাবাদের বন্দনা শুরু করে। ইরানে বি-ইসলামীকরণের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিভিন্ন রূপে শুরু ও অব্যাহতভাবে চালানো হয়। ইরানী জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পাহলভী শাসকগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের এক ভুয়া চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। রাজ-লেখক ও শিল্পীরা ছিল এর উদ্যোক্তা। পাহলভী শাসনের সমগ্র পর্যায় তাবৎ সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তিত্বরা পারসীয় হরফের স্থলে ল্যাটিন হরফ চালু করার অব্যাহত চেষ্টা চালায়। এ কাজটিকে ইরানী জাতিসত্তার ওপর এক ধ্বংসাত্মক আঘাত এবং ইসলামী সংস্কৃতি, পারসীয় লেখন পদ্ধতি, কবিতা, গল্প ও গদ্য সাহিত্যের জন্যে ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচনা করা হয়। ইরানী জাতীয়তাবাদের ওপর এ ধরনের আঘাত হানার পাশাপাশি শাসকগোষ্ঠী আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক ও তীব্রভাবে প্রচার চালায়। ইরানী জনগণকে ইরানে ইসলামের আগমন এবং আরব মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও আরবদের স্থূল ভাবমূর্তি তুলে ধরার লক্ষ্যে এটি করা হয়। ইরানী জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ বোধ উস্কে দিয়ে এবং আরবদের সম্পর্কে ইরানীদের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগিয়ে

www.pathagar.com

তুলে ইরানী ও আরবদের মধ্যে ইসলামী ঐক্য ধ্বংস করা সম্ভব এবং ইরানে ইসলামের বদলে জাতীয়তাবাদকে স্থলাভিষিক্ত করা যায় বলে শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল। এটা চমৎকার ব্যাপার যে, পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর প্রচারিত জাতীয়তাবাদও প্রকৃত ইরানী জাতীয়তাবাদ ছিল না; এটা ছিল এমনই এক জাতীয়তাবাদ যা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং সে অনুসারে সংশোধিত। বিগত ৫০ বছরে ইরানী জনগণ বহু নকল জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখেছে। ইরানী জাতীয়তাবাদের রক্ষক হিসেবে ভান করেছিল এবং এখনো ভান করে যে, "জাতীয় ফ্রন্ট", তা শাপুর বখতিয়ারের মত ব্যক্তিদের লালন-পালন করেছিল। শাপুর বখতিয়ার ইরানী ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জটিল মুহূর্তে আমেরিকার সাহায্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিল এবং আমেরিকার পুতুল সরকারকে রক্ষার জন্যে শাহের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল। এই পদলেহন-কারীরাই জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে প্রধানমন্ত্রীত্বের সংক্ষিপ্ত কার্যকালে জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিয়েছিল। রাজকীয় পরামর্শদাতা পরিষদে এক হাস্যকর সংখ্যালঘু অংশ গঠন করেছিল যে "প্যান ইরানী" দল, সে দলটিই জাতীয়তা-বাদী শ্লোগান দিয়ে আমেরিকার সর্বোত্তম সেবা করেছে এবং পাহলভী শাসক-গোষ্ঠীর অপরাধসমূহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ইরানী জাতীয়তাবাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করেছে। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরেও জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের কার্যক্রম ছিল। এ কার্যক্রম সবসময় উপনিবেশবাদীদের বিশেষতঃ আমেরিকার সুবিধার দিকে এবং জনগণের আশা-আকাংখার বিরুদ্ধে গিয়েছে। অন্যান্য ইসলামী দেশেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহ উপনিবেশিকরণের বিরুদ্ধেঅব্যাহত সংগ্রামকারী শক্তিসমূহের ক্ষতি করেছে। আরব দেশসমূহে "প্যান আরববাদ", তুরস্কে "প্যান তুর্কীবাদ" এবং অন্যান্য ইসলামী দেশে এ ধরনের মতবাদ অগ্রগতি রোধে উপনিবেশবাদীদের সেবায় কাজ করেছে। প্রাচীন ও জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের অজুহাতে পুতুল শাসকগোষ্ঠীসমূহ একটি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতির স্থানে বসিয়ে দেয়ার জন্যে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালায়। ইরানে ইউরোপীয় ও আমেরিকান "ইরানবিদদের" সাহায্যে প্রাচীন ধর্মগুলো পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী ইতিহাসের বদলে ইরানী ইতিহাস চালু করার জন্যে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রচেষ্টারও লক্ষ্য ছিল ওটাই।

পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ

"উপনিবেশীকরণের" মত "উদারতাবাদ"ও একই বদ মতলবে পশ্চিমারা ব্যবহার করে। এ কারণেই "পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ" ও প্রকৃত উদারতাবাদের

www.pathagar.com

মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। "উপনিবেশীকরণ" শব্দটি দিয়ে উন্নয়ন ও সভ্যতা বোঝায় এবং এ চমৎকার নামের আড়ালে উপনিবেশবাদীরা অঞ্চলের পর অঞ্চল লুণ্ঠন করছে, অনুরূপভাবে "উদারনৈতিকতাবাদ" শব্দটি দিয়ে বোঝায় যে কোন মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্তি। মুক্তি অন্বেষী ব্যক্তির ক্ষেত্রে "উদারনৈতিক" শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু এ শব্দটি উপনিবেশবাদীদের কব্জায় আসার পর থেকে এটি নয়া-উপনিবেশীকরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, এ শব্দটি এখন সকল মানবীয় ও ঐশ্বরিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি এবং নয়া-উপনিবেশবাদীদের আরোপিত বিধি-নিষেধ ও সীমাবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ বোঝায়। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য প্রাণী থেকে তার মধ্যে যেসব মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে সেগুলো দাবী করে যে, মানুষের উচিত কোন বিধি-নিষেধ বা সীমাবদ্ধতার মধ্যে না থেকে আত্মবিকাশের পথ অনুসরণ করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ কোরানে এরশাদ করেছেন ঃ আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি; সে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হতে পারে। (সূরাতু-দ-দহর, ৩য় আয়াত) অর্থাৎ মানুষকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছে। সে ন্যায় বা অন্যায়, কোন্ পথে যাবে, সেটা তার ওপর নির্ভর করে। কোন মানুষ যদি আল্লাহ প্রদর্শিত ন্যায়ের পথ বেছে নেয়, তাহলে তাকে খোদার দাসত্ব ছাড়া অন্য সকল বিধি-নিষেধ, দায়-দায়িত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলামের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পবিত্র নির্দেশাবলীর আনুগত্য ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর সীমা লংঘনকারী সকল শক্তি হতে মুক্তি। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মানুষ এতই স্বাধীন ও মূল্যবান যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অধীনে নিজেকে, নিজের চিন্তাকে, নিজের উপলব্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও পছন্দকে সমর্পণ করা উচিৎ নয়। এর অর্থ, মানবকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে, এমন সব বৈষয়িক বন্ধনের অস্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে "উদারনৈতিকতাবাদের" প্রকৃত অর্থের সাথেই এ বক্তব্যের মিল রয়েছে।

এরই পাশাপাশি, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে আল্লাহর গোলাম বলে মনে করে। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে তার সমগ্র সত্তা কোরবান করতে হয়, অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে আল্লাহর নির্দেশ। এ বিষয়টিকে ইসলাম এতই গুরুত্ব দেয় যে, তা পবিত্র কোরানে উল্লেখিত হওয়া ছাড়াও নবী করিম (দঃ) ও ইমামদের ঐতিহ্যের মধ্যে দেখা যায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোরানের একটি আয়াতে সৃষ্টির লক্ষ্য বর্ণনাকালে ঐ ব্যাখ্যা দিয়েই বলেছেন ঃ আমার সেবা করা ছাড়া অন্য কোন কারণে আমি জ্বীন ও মানুষ তৈরী করিনি। (সূরাতু-দ-দহরিয়া ৫৬ আয়াত)। এ আয়াতে "আমাকে সেবা কর" (ইয়াবুদুনী) শব্দের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে অন্য কিছু বলার আগে

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে চরম আনুগত্য প্রকাশ ও তার দাসত্ব মেনে নেয়ার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। এটা কেবল আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, মানবজীবনের, বিশেষতঃ সামাজিক সম্পর্কসমূহের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পয়গম্বর প্রেরণের কারণ ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে তাগুত (শয়তানী প্রভাব) এড়ানোর এবং নিপীড়ন ও স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেনঃ প্রত্যেক জাতির কাছে আমরা নবী পাঠিয়েছি এ কথা বলার জন্যে যে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর। (সুরাতু-ন-নহল, ৩৬ আয়াত)। এজন্যেই অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দিষ্ট হয়েছে, তা হলো ঃ মানুষের উচিত হবে না শেরেকী করা, মানুষকেও সৃষ্টিকর্তা বিবেচনা করা উচিৎ নয়। আসমানী কিতাব বিশ্বাসী জনগণ, আমাদের সাথে এক সমতাপূর্ণ চুক্তিতে আস, যাতে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত না করি, আমাদের কেউ যেন অন্য কাউকে আল্লাহর শরীক না করে। (সুরাতু-আল ইমরান, ৩৬ আয়াত; সুরাতু-ন-নহল, ৩৬ আয়াত)। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহর গোলামী ছাড়াও এ আয়াতে আরো দু'টি নীতিমালার কথা রয়েছে ঃ বহুত্ববাদ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বানানোর কাজটি বর্জন। এতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, কেবল মানুষের এবাদত নয়, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর গোলামী এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরদের সম্পর্কে যে সুন্দর আখ্যা ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে আব্দ (গোলাম, দাস)। সুরাতু সোদ, ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমার দাস ক্ষমতা ও অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ইব্রাহিম (আঃ), ঈসা (আঃ) ও জ্যাকবকে (আঃ) স্মরণ কর। পবিত্র কোরানে পয়গম্বরদের ইবাদ (চাকর) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের নবীকে সবসময় 'গোলাম' শব্দটি ব্যবহার করে উল্লেখ করেছেন। নবীকে বলা হয়েছে আল্লাহর গোলাম হিসেবে ঃ তার প্রশংসা হোক, যিনি তার গোলামকে রাত্রিবেলা আল-মসজিদ আল-হারাম থেকে আল-মসজিদ আল-আকসায় নিয়ে যান। (সুরাতু বনি ইসরাইল, ১ আয়াত)। এছাড়া পয়গম্বরগণ নিজেদের উল্লেখকালে নিজেদের ক্ষেত্রে আব্দ শব্দ ব্যবহার করেন এবং এ শব্দটিকেই একটি উপযুক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা যীশু খৃষ্টের প্রথম দিকের সংলাপগুলোর একটি দেখতে পারি ঃ আমি খোদার গোলাম, তিনি আমাকে তার বই দিয়েছেন, আমাকে করেছেন তার নবী। (সুরাতু মরিয়ম, ৩০ আয়াত)। এমন আরো অনেক আয়াত আছে, যা এ আলোচনাকে আরো অর্থময় করে তুলবে। তবে কেবল একটি আয়াত উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে ঃ আকাশে ও পৃথিবীতে সকল প্রাণী আল্লাহর গোলাম। (সুরাতু মরিয়ম, ৯৩ আয়াত)।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও, পবিত্র কোরানে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহর গোলামী করার পাশাপাশি মানুষকে আল্লাহ ছাড়া সকল কিছু থেকে স্বাধীন হতে হবে। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে এ বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে। এসব আয়াত ছাড়াও, আমীর উল মুমেনিন, তার ইচ্ছাপত্রে ইমাম হাসানকে বলেন, মানুষ ব্যক্তি নয়, আল্লাহর দাস হবে। তাঁর কথাগুলো হচ্ছেঃ "তোমাকে আল্লাহ স্বাধীন করে তৈরী করেছেন। তাই অন্য কোন মানুষের দাস হবে না।" (নাহজুল-বালাগা)। অর্থাৎ মানুষকে কেবল আল্লাহর দাস হতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের থেকে হতে হবে স্বাধীন। এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদার-নৈতিকতাবাদ বলতে কি বোঝায়, তা স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া সব কিছু এবং সবার থেকে মানুষের স্বাধীনতাই প্রকৃত উদারনৈতিকতা। কিন্তু পশ্চিমা উদার-নৈতিকতাবাদ একেবারে বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে এ উদারতাবাদ স্বাধীনতা নস্যাৎ করে।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত তৃতীয় বিশ্বে উদারতাবাদ বলতে আল্লাহর আদেশ থেকে স্বাধীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার দাসত্বকেই বোঝানো হয়। বিজ্ঞানের নামে পশ্চিমা উদারনৈতিক ব্যক্তি ঐশ্বরিক প্রকৃতি থেকে পলায়ন ও পাশবিক গুণাবলীতে আশ্রয় গ্রহণকে বোঝে। পশ্চিমা উদারতাবাদে বিভিন্ন পাপ এবং মিথ্যা কাঠামোতে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং একেই দেখানো হয় মহান মানবীয় মূল্যবোধ হিসেবে। "স্বাধীনতা" শব্দটি এই মিথ্যা কাঠামোকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করে। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা উদারতাবাদ এমনই এক কসাইখানা, যেখানে মুনাফাখোরী, লম্পট ও খোদায় অবিশ্বাসীদের শয়তানী প্রকৃতির ইচ্ছার বেদীতে স্বাধীনতাকে বলী দেয়া হয়।

বি-ইসলামীকরণের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে উপনিবেশবাদীরা এ ধরনের উদারতাবাদকেই গ্রহণ করে। মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে আল্লাহর কথা যখন লুপ্ত হয়, তখনই মঞ্চেআবির্ভূত হয় পশ্চিমা উদারতাবাদ। এ চিন্তা মানুষকে বৈষয়িক জগতের সাথে বেঁধে ফেলে, আল্লাহ থেকে দূরে টেনে নেয়। পশ্চিমা ব্যাখ্যা অনুসারে একজন উদারনৈতিক ব্যক্তি হচ্ছেন সেই লোক, যিনি নিজেকে আত্মত্যাগ, শাহাদৎ বরণের আকাঙ্ক্ষা, খোদাভক্তি, ক্ষমাশীলতা, শুদ্ধতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, সাহসিকতাসহ আল্লাহর এবাদত, সংশ্লিষ্ট চেতনা ও অন্যান্য গুণাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। তিনি হচ্ছেন এমনই একজন, যিনি ধন-সম্পদ, আয়াশ, সামাজিক অবস্থান, বাহ্যিক ব্যবহার, সীমাহীন যৌন সংস্রব, বুদ্ধিবৃত্তিগত দাসত্ব, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং দেহ ও পার্থিব জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুতে আগ্রহী।

আল্লাহ ও তার ঐশী আদেশাবলীর প্রতি ভক্ত মানুষকে উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত "পশ্চিমা উদারনৈতিকে" রূপান্তর করার কাজে উপনিবেশবাদীরা

www.pathagar.com

ব্যাপক চেষ্টা চালায়। আন্দালুসিয়ায় (স্পেনে) ফরাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে উপনিবেশবাদীরা বোঝে যে, উচ্ছৃংখল যৌন সম্পর্ক, জুয়ায় ও মদে আসক্তি এবং ভোগসুখবাদ পার্কে নিমগ্ন করাই হচ্ছে উপযুক্ত পন্থা, যা দিয়ে মুসলমানদের অন্যত্র ব্যস্ত রাখা সম্ভব।

খোদাকে ভুলে যাওয়া ও দুর্নীতিবাজ হয়ে যাওয়া মুসলমানদের যে কোন শক্তি সহজেই আধিপত্যাধীনে আনতে পারে। স্পেনে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের এভাবেই নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও ইহুদীরা ফরাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন প্রত্যেক মুসলমান দেশের মর্মমূলে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের মত শিকড় বিছিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে, ইরানেও পাহলভী রাজবংশের পরিকল্পনা ছিল মানুষকে আল্লাহর এবাদত থেকে দূরে টেনে আনা। পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদে আসক্ত করে তারা এটা করতে চেয়েছিল। কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে নিজেদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই উপনিবেশবাদীরা এটা পরিকল্পনা করেছিল।

প্রকৃত অভিপ্রায়

একটি ইসলামী সরকার গঠন ও প্রকৃত ইসলামের নীতিমালা প্রতিষ্ঠায় জনগণের দৃঢ়সংকল্পই ছিল ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রধান অভিপ্রায়। বিগত শতাব্দীতে ইরানী জনগণ একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু চেষ্টা চালায় এবং দৈহিক ও বৈষয়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ কাজে তারা ব্যর্থ হয়। তবে এসব সংঘাতে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনার সাহায্যে শত্রুরা হয়ত একটি দীর্ঘ পর্যায়ের পরে ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পারে বলে ইরানী জনগণ বুঝতে পারে। তাই জনগণ মনে করে কোন সংগ্রাম করে লাভ হবে না। এর ফলে জনগণ ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশা হারিয়ে ফেলে। পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে ইসলাম নির্মূলকরণের চক্রান্তই এই নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। ভাড়াটে শাহ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এ চক্রান্ত বাস্তবায়নে সকল শক্তি নিয়োগ করে।

অপরদিকে, যে আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের লেশমাত্র ছিল বা ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু থাকত, তাতে প্রকৃত ইসলামী সংগঠনগুলো অংশ নিতে প্রস্তুত ছিল না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহের নেতৃবৃন্দের কাজ-কর্ম এবং ঐ নেতাদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ বিগত সংগ্রামগুলোতে ধর্মীয় লোকদের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের মনোভঙ্গীর কারণে এমন হয়েছিল।

www.pathagar.com

এ কারণেই, জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ ও জাতীয় ধর্মীয় সংগঠনগুলো অব্যাহত সংগ্রামে আগ্রহী থাকলেও ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্টের অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৬১ সালে ইমাম খোমেনীর আন্দোলন শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়নি।

ইমাম খোমেনী প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করায় তিনি প্রকৃত ইসলামী শক্তিসমূহের ও জনগণের আস্থা অর্জন করেন। উপনিবেশবাদীরা রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে এদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তিনি উপনিবেশবাদীদের প্রতিনিধি পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উৎসাহ দেন। ইরাহী জনগণ ইমাম খোমেনীকে এতই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করত যে, ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন তাকে গ্রেফতার করার পরে জনগণ বিদ্রোহ করে। জনপ্রিয়তা ও ইসলামী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ বিদ্রোহকে ইরানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলা যায়। অনৈসলামিক শক্তিসমূহ কখনো এমন আন্দোলন গড়তে পারেনি। ৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থান এক মহান আন্দোলনের সূচনা, যা ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিপ্লবের পতাকাতলে জয়লাভ করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পশ্চাতে মূল অভিপ্রায় ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবন, একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পবিত্র কোরান অনুসারে আল্লাহর আইন বলবৎকরণ।

প্রেরণাদায়ী অন্যান্য বিষয়

অন্যান্য প্রেরণাদায়ী বিষয়সমূহ বিশ্লেষণের পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কোন ইসলামী সরকার নিয়ে আলোচনার সময় এ সরকারের চরিত্র ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় সরকার সম্পর্কে বিশ্বের অধিকাংশ লোকের ধারণার চেয়ে ইসলামী সরকার খুবই ভিন্ন ধরনের। খৃষ্টান ধর্মসহ অন্য যেসব ধর্ম কেবল উপাসনায় সীমাবদ্ধ, ইসলাম তেমন ধর্ম নয়। ইসলাম ইহকাল ও পরকালের ধর্ম। এবাদত ছাড়াও এ ধর্মে মানবজীবনের অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো স্থান পেয়েছে। অন্যান্য ধর্ম কোন ধর্মীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অন্য আদর্শ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক নীতিমালা ধার করতে হবে। ইসলামী শিক্ষায় আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও বিষয়াদি ছাড়াও জীবনের সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুদ্ধ, সর্ব বিষয়েই ইসলামের নিজস্ব

www.pathagar.com

নীতিমালা আছে। এসব ব্যাপারে অন্য ধর্ম থেকে নীতিমালা ইসলামকে ঋণ নিতে হবে না।

তাই, যখন বলা হয় যে, ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামে ইরানী জনগণের মূল প্রেরণাদায়ী অভিপ্রায় ছিল একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, তখন এটাই বোঝায় যে, ইরানী জনগণ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, এবং যে নীতিমালাতে কেবল আধ্যাত্মিক নয়, জীবনের সকল দিকই আলোচিত ও নির্দেশিত হয়েছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক চেতনা এবং অভিপ্রায়ও এ বিপ্লবের পেছনে কাজ করেছে। ইরানী জনগণ উপলব্ধি করেছে যে, তাদের অর্থনীতি পরনির্ভরশীল। এটা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। তাই তারা সমাজে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের দাবী জানায়। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, তাই তারা স্বাধীনতা ও ইসলামী রাজনৈতিক শিক্ষা অনুসরণের দাবী জানায়। অনুরূপভাবে তারা স্বাধীন সেনাবাহিনী ও একটি স্বাধীন ইসলামী সংস্কৃতি চেয়েছিল। এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন কেবল একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভবপর ছিল।

সাংস্কৃতিক পরনির্ভরশীলতা

ইরানের জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ মুসলমান। তাই এটা স্বাভাবিক যে ইরানের সামাজিক ব্যবস্থা একটি ইসলামী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষা থেকে উৎসারিত। এ সত্ত্বেও পাহলভী শাসকগোষ্ঠী ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস এবং পশ্চিমা মূল্যবোধের ভিত্তিতে পশ্চিমা সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিপুল প্রচেষ্টা চালায়। এ নীতির ফলশ্রুতি হচ্ছে উপনিবেশগুলোর পুরোপুরি দাসত্ব।

পশ্চিমা ব্যবস্থায় মানুষ একজন ভোক্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে এমনই এক ভোক্তা, যে কেবল আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রীই ভোগ করে না, চিন্তা-চেতনাও হজম করে। এ মূল্য ব্যবস্থায় নারী পণ্য ব্যতীত, পুরুষের লিপ্সা চরিতার্থের ও সজ্জার উপকরণ ভিন্ন কিছু নয়। পশ্চিমা জগতকে নকল করে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর নেতারা ইরানী মুসলিম নারীকে নামিয়ে আনল এমনই এক স্তরে, যেখানে নারীর ভূমিকা হল "অভিনেত্রীর"। আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রী ও ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার বিজ্ঞাপন ও প্রদর্শনেই তাকে নিয়োগ করা হল এবং এটাই হল তার কাজ ও সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পেশা। আপাতঃদৃষ্টিতে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী অপমানজনক মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি প্রচণ্ড অপমান।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজে নারীর সহজাত মহত্ত্বই তাকে সতীত্ব রক্ষার ও ধার্মিক সন্তান লালনে এবং সমাজের আধ্যাত্মিক ও গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। আমদানীকৃত পণ্য ও চিন্তার বিজ্ঞাপনকারী এবং পুরুষের যৌনলিপ্সার সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে অযোগ্য স্থানে তার মর্যাদাকে লাঘব করার ব্যাপারটি নারীর সম্মান ও মান-মর্যাদার প্রতি সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা।

১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মে ফারাহ পাহলভীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিরাজ চিত্রোৎসব নামের আড়ালে ঐ নগরীর মুসলমান বাসিন্দাদের বিস্ময়াভূত দৃষ্টির সামনে যৌন ক্রিয়াকলাপ চালানো হয়। এ ধরনের প্রদর্শনী কেবল মানুষের মানবিক সত্ত্বার মহত্ত্বের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এটা সৃজনী ক্ষমতার অপচয়ও বটে। ইরানের ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদীরা যেসব অপরাধ করেছিল, এটা তার অংশ মাত্র।

সংস্কৃতির আরেকটি অংশ ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও শিক্ষার অন্যান্য পর্যায়ে বিরাজিত ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি ঔপনিবেশিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পাশ্চাত্য থেকে নেয়া হত, এমনকি ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আসত বহু শিক্ষক। মানব বিজ্ঞান, বিশেষতঃ নীতিবিজ্ঞান উপযুক্ত গুরুত্ব পেত না; যেসব বই থেকে এগুলো শেখানো হত, সেগুলো পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে ঋণ করে আনা।

মানব বিরোধী ও পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ তুলে ধরার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন, বিশেষতঃ সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন ঘটানো ছাড়া শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কাজ ছিল না। শিল্প-সংস্কৃতির তথাকথিত দফতর কেন্দ্রগুলো বেশ্যাবৃত্তি ও যৌন বিকৃতির কেন্দ্র ভিন্ন কিছু ছিল না। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি সংবাদপত্র পুরোমাত্রায় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি তুলে ধরত, এ বিশ্বাসঘাতকতার কাজে ব্যবহার করত বিপুল অর্থ। ডিগ্রীর ধান্দায় ঘুরে বেড়ানো ও বিজ্ঞানের অপবাদ দেয়া ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। ইরানী যুব সম্প্রদায়ের জ্ঞান অর্জন যাতে কখনোই সমাজের কল্যাণ না করে, সেটাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

পশ্চিমা-প্রবণতা ইরানী সমাজকে সংক্রামক রোগের মত আক্রান্ত করছিল। আমেরিকা বা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডিগ্রীধারীরাই প্রতিষ্ঠানিক দিক থেকে সর্বাধিক সম্মান পেত যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ছিল ইরানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের তুলনায় কম কিংবা অন্ততঃ পক্ষে তাদের সম পর্যায়ের নয়। পশ্চিমা দেশগুলো বেড়ানো, কয়েকটি ইংরাজী বা ফরাসী শব্দ শিখে দৈনন্দিন কথোপকথনে তা আওড়ানোকে মূল্যবান বলে মনে করা হত।

www.pathagar.com

পশ্চিমা জগতের নকল করে পোশাক পরিধান, রূপসজ্জা, হাঁটা, খাওয়া, সভা করা, নাচা, বিলাস করা, এমনকি শিশুদের নাম, সরণী, সড়ক ও দোকানের নাম রাখার ব্যাপারটি ইরানী জনগণের জন্যে অভ্যাসে পরিণত হচ্ছিল দ্রুত।

রাজদরবারের ও অভিজাত পরিবারগুলোর মেয়েরা পোশাক তৈরী, কেশ বিন্যাস বা রূপসজ্জার জন্যে ইউরোপ যেত। ইরানের বিপুলসংখ্যক জনগণ যখন জীবনের অপরিহার্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত ছিল, তখন ঐ মহিলারা বিশেষ বিশেষ পোশাক নির্মাতা ও কেশসজ্জাকারীদের ডেকে আনত। অনেক ইরানী নিজেদের চোখের সামনে শিশুদের মারা যেতে দেখেছে।

সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা এত বেশী ছিল যে, তা জনগণের জীবনের সর্বত্র বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। অতীতে ইরানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে চমৎকার ঐতিহ্য ছিল। এখানে ছিলেন ইবনে সিনা ও রাজীর মত মুসলমান চিকিৎসকরা। চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইরান যেন কেবল স্ব-ঐতিহ্যই না হারায়, সেই সাথে মৌলিকভাবে পশ্চিমা জগতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, সেজন্যে ইরানের সংস্কৃতিকে পরনির্ভরশীল করতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এমনকি সাধারণ ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামও ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আমদানী করা হত। সবচেয়ে ব্যাপক ছিল বুদ্ধিবৃত্তিগত নির্ভরশীলতা। পাহলভী শাসকগোষ্ঠী এ জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চালায়। এ নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতিতে ইরানী যুব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিগত দিক থেকে বিকশিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না, ইরানী সমাজ ক্রমেই নৈতিকভাবে অবক্ষয় হয়ে স্বীয় ইসলামী সংস্কৃতি ত্যাগ করে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তিগত পণ্যসামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

এ অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং একটি ইসলামী সংস্কৃতি চালু করাই হচ্ছে এ অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সংস্কৃতিই প্রতিটি বিপ্লবের মৌল অবকাঠামো। তাই এ মনোভাব ইরানী জাতির প্রকৃত ও অপরিহার্য অভিপ্রায় থেকে পৃথক নয়। সে অভিপ্রায় হচ্ছে একটি ইসলামী সরকার গঠন। এ কারণেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া কোন প্রকৃত বিপ্লব টিকে থাকতে পারে না।

অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা

ইরানের মত ধনী দেশসমূহের জনগণের তুলনায় স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ বিশিষ্ট দেশের জনগণের জন্যে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা হয়ত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। যদি ইরানী জনগণের এমন একটি ধর্ম থাকত যে ধর্মে ন্যায়ানুগ ও স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা নেই, তাহলে সে জনগণের পক্ষে পূর্ব, পশ্চিম বা

www.pathagar.com

উভয়ের ওপরই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি সহ্য করা সহজ হত। কিন্তু ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপক এবং ইসলামী শিক্ষায় এমন এক ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে যা বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে ভালভাবে কাজ করে। এ অবস্থার মধ্যেও, পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর শাসনকালে ইরানের অর্থনীতি বিশ্ব নিপীড়কদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পাহলভী শাসকগোষ্ঠী ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবহেলা করত, রূপায়ণ করত পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিও প্রকৃত শিল্পের পথে রূপায়ন করত না। এটা করত সংযোজন কারখানা গড়ে ও পশ্চিমা পণ্যের বাজার তৈরী করে। এটাই ছিল নির্ভরশীলতার কারণ। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যাপ্ত মাধ্যম থাকলেও পাহলভী শাসকগোষ্ঠী খাদ্য আমদানী করত। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার মত জনশক্তি যাতে না থাকে, সে জন্যে শহরে চলে আসার জন্যেও কৃষকদের উৎসাহিত করত। ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা অনুসারে গ্রাম থেকে আসা লোকদের হয় সংযোজন শিল্পে কাজ দিয়ে নতুবা লটারীর টিকিট বিক্রি বা চুরি অথবা অন্যান্য অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে শহর-নগরে ও শিল্পাঞ্চলে আত্মস্থ করা হত। সংযোজন কারখানাগুলো ঔপনিবেশিক দেশের সাথে সম্পর্কিত ছিল। কোনটি ঐসব দেশের বা ঐ দেশগুলোর ধনীদের মালীকানাধীনও ছিল।

এর ফলে, ১৯৭৭ সালে ইরানের খাদ্যোৎপাদন ক্ষমতা ছিল দেশের ৩১ দিনের, অর্থাৎ মাত্র এক মাসের চাহিদা মেটানোর মত! অবশিষ্ট ১১ মাসের চাহিদা মেটানো হত আমদানী করে। একই সাথে সরকার দৈনিক ৬০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করত এবং উপার্জিত অর্থ দরবারের ব্যয় নির্বাহে, ইসলামের শ্বাসরোধের জন্যে, উপনিবেশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, সাভাক (শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য গোয়েন্দা সংস্থা ও গুপ্ত পুলিশ বাহিনী)-এর ক্ষমতা বাড়ানোর কাজে, বিরোধী পক্ষকে দমনে এবং এক নিপীড়নময় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ব্যয় করত। জনগণ জানতে চাইত, তেল বিক্রির উপার্জিত অর্থ কৃষি ও গবাদীপশু খাত উন্নয়নে ব্যয় হয় না কেন? ইরানের কৃষি জমি পুনরুদ্ধারের বদলে বর্তমানে গ্রামগুলো ধ্বংসের চেষ্টা করা হয় কেন? দেশের মধ্যে স্বনির্ভর শিল্পোৎপাদন মাধ্যম যোগানো ও মৌল শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে কেন সংযোজন কারখানা সম্প্রসারিত হয়? এর ফলে কি আমাদের সকল চাহিদা—খাদ্য, শিল্প সরঞ্জাম, ইত্যাদি—বিদেশী ও উপনিবেশ-বাদীদের দয়ার ওপরে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে না? এর মাধ্যমে কি তারা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জীয়নকাঠি তাদের হাতের মুঠোয় পাবে না? তারা ইচ্ছে করলেই মন্ত্রপূত কাঠির সাহায্যে আমাদেরকে তাদের বাধ্য করে তুলবে। আমরা কি স্থায়ীভাবে তেলের ওপর নির্ভরশীল হব এবং তেল ফুরিয়ে গেলে নির্ভর করার মত

www.pathagar.com

আয়ের অন্য উৎসের কথা ভাবব না? এসব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হিসেবে শাসকগোষ্ঠী আরো তেল আহরণ এবং তা রফতানী করে অর্জিত অর্থ সুখভোগে ব্যয় করত, তারা নিজেদের সাধ্যমত এবং যত জায়গায় সম্ভব, সব স্থানে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ক্রমান্বয়ে কৃষি ও শিল্প ধ্বংস করে দেয়া হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল ব্যাপক ঃ শাসকগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট সামাজিক শ্রেণীটির এত অর্থ ছিল যে, তারা নিজেরাই জানত না কিভাবে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে। বঞ্চিত শ্রেণীকে লুণ্ঠন করে অর্জিত হয়েছিল এ অর্থ। নিজের অভিষেকের জন্যে আপ্যায়ন ও আনন্দের ব্যবস্থা করতে শাহ বিদেশ থেকে সামগ্রী আমদানী করে। মাত্র কিছু ফুলের জন্যে একটি বিমান পাঠায় নেদারল্যান্ডে, দেশের সম্পদের শত-সহস্র রিয়াল ব্যয় করে। পারস্য সাম্রাজ্যের আড়াই হাজার বছর পালনের জন্যে সে শত-শত কোটি রিয়াল ব্যয় করে। পারস্য সাম্রাজের রাজারা দেশের জনগণকে নিপীড়ন করে ক্ষমতা দখল করে। প্রতি রাতে লাখো-লাখো রিয়াল ব্যয় করা হত। আর এ রিয়াল আসত বঞ্চিত জনগণের শ্রম থেকে। রাজ দরবার মদপান, জুয়া ও যৌন সংগমের ব্যবস্থা সম্বলিত উৎসবের আয়োজন করত প্রতি রাতে। এ অবস্থায় ইরানের অসংখ্য মানুষ দারিদ্রোর কারণে ঘাস-পাতা-আগাছা খেয়ে জীবন বাঁচাত। উৎসব প্রাসাদের কাছে—শিরাজের মরুভূমিতে — নিষ্পাপ শিশুরা মারা যেত। কারণ তাদের ছিল না খাদ্য, ছিল না চিকিৎসা, জীবনের মৌল চাহিদার সবই ছিল অনুপস্থিত।

পরনির্ভরশীল অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক অনাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ; তেল, তামা, লোহা, কয়লা ও সীসার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে ; ১৬ লাখ বর্গ কিলোমিটার কৃষি জমি পুনরুদ্ধারে জনশক্তি ব্যবহারে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নয়—ইসলামের ভিত্তিতে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার বাসনাই ইরানী জনগণকে পাহলভী শাসকগোষ্ঠী উৎখাত করে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যুগিয়েছে। এ স্বনির্ভর অর্থনীতি হচ্ছে এমনই এক তৃতীয় পথ, যে ব্যবস্থায় সম্পদ একজনের বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরকারের মত একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর হাতে জমা হয় না।

সামরিক নির্ভরশীলতা

পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর সময়ে তেল বিক্রি করে অর্জিত ইরানের বিপুল অর্থ আমেরিকান ও ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় করা হত। তবে এ অস্ত্র ইরানের স্বাধীনতা রক্ষায় একবারও ব্যবহার করা হয়নি। এসব অস্ত্র রক্ষণা-বেক্ষণ ও আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টাদের বেতন

www.pathagar.com

প্রদানের অর্থ ইরানী জনগণের ওপর বিপুল ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়। ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ জন্যে ইরানকে অর্থ প্রদানের পরিবর্তে আমেরিকান সরকার নিজের সামরিক লোকদের বেতনের জন্যে ইরানের কাছ থেকে অর্থ নিত। ইসলামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাইল ইরানী বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করত। ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইলী বিমান ইরানী বিমান ঘাঁটিগুলো থেকে তেল নিত, ইসরাইলী সেনাবাহিনী ব্যবহার করত ইরানী বাহিনী, এবং এভাবেই আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ পেত সাহায্য-সেবা। ইরানের সামরিক বাহিনী খুবই দক্ষ হলেও এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আমেরিকানদের চেয়ে দক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমেরিকানদের তুলনায় দক্ষতা, গুণাবলী ও ক্ষমতায় সমকক্ষ হলেও তাদেরকে আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণ ও আমেরিকানদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হত। কোনভাবেই ইরানী বাহিনীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। একজন আমেরিকান নন-কমিশন অফিসারের অধীনে, এমনকি আমেরিকানের চেয়ে কম বেতনে ইরানী অফিসারকে থাকার লজ্জা মেনে নেয়া আমাদের মহান সামরিক লোকদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। কেবল জনগণ নয়, সামরিক লোকদের জন্যেও এ ব্যবস্থা ছিল অসহনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইরানী জনগণের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সামরিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া। ইরান এক স্বাধীন, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী চায়, যে বাহিনী দখলদার ইহুদীবাদের থেকে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিতের সহায়ক হিসেবে, বিশ্বের নিপীড়ক-দের আধিপত্য নির্মূলকরণের শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা

ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মুসলমানরা অ-মুসলমান দেশ ও জাতির সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। তবে এ ধরনের সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। দুর্বলের অধিকারের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারী এবং বঞ্চিত দেশসমূহকে নিপীড়ন-কারী ও এসব দেশের অধিকার লঙ্ঘনকারী দেশের সাথে কোন ইসলামী দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

পাহলভী শাসনামলে কেবল ইসলামের এই সুনির্দিষ্ট নীতিমালাই লঙ্ঘিত হত না, পাহলভী শাসকগোষ্ঠী ইরান ও অন্যান্য দেশের ওপর উপনিবেশবাদীদের থাবা বিস্তৃত করতে সর্বাত্মক সাহায্যও করত। ১৯২০ সালে বৃটেনের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে পাহলভী বংশের শাসন শুরু। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রেজা খানের শাসন অব্যাহত থাকে। বৃটেনের সরাসরি

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে তার পুত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট বৃটিশ সহায়তায় আমেরিকান অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাহ ক্ষমতাসীন হয়। পাহলভীর অধীনে ইরানের সরকার ছিল পুরোপুরি বশংবদ। এ কারণেই ভাড়াটে শাহ ১৯৭৮-এর শরতে, ইরান থেকে পলায়নের পূর্বে প্রদত্ত এক ভাষণে স্বীকার করে যে, তার মজলিসে কোন্-কোন্ সদস্য আসন লাভ করবে, তাদের নামের তালিকা তেহরানে বৃহৎ শক্তিবর্গের দূতাবাসগুলো তৈরী করে তাকে দিত। মজলিস দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ের সাধারণ নীতি প্রণয়নের কেন্দ্র। দূতাবাসের দ্বারা বাছাইকৃত মজলিস সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই ছিল এসব দেশের প্রতিনিধি—এসব প্রতিনিধি ইরান নয়, ঐসব দেশেরই স্বার্থ রক্ষা করত। ফলশ্রুতিতে দেশের ভেতরে ও বাইরে ইরানের নীতি ঔপনিবেশিক দেশসমূহের ইচ্ছামাফিক প্রণীত হত। পাহলভীর শাসন আমলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার নিপীড়করা ইরানের ওপর হাজার হাজার ঔপনিবেশিক চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এসব চুক্তির সাহায্যে ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বিদেশীরা। কৃষি ও শিল্প ধ্বংস করা হয়, ইরানের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সেনাবাহিনী ঔপনিবেশিকদের, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১৯৬৪ সালে স্বাক্ষরিত ও মজলিসে অনুমোদনপ্রাপ্ত লজ্জাকর চুক্তিটির তীব্র প্রতিবাদ করেন ইমাম খোমেনী। এ চুক্তি অনুসারে আমেরিকান নাগরিকদের বিচারের এখতিয়ার কোন ইরানী আদালতের ছিল না। এ প্রতিবাদের কারণে সিআইএ'র নির্দেশে শাহের সাভাক ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করে ও তুরস্কে নির্বাসনে পাঠায়। এ চুক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর চুক্তিগুলোর নমুনা এবং এটাই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, বিদেশীদের সাথে এই শাসকগোষ্ঠীর কি ধরনের রাজনৈতিক সখ্যতা ছিল। এ চুক্তি অনুসারে কোন আমেরিকান নাগরিক যে অপরাধই করুক না কেন? তার জন্যে ঐ আমেরিকানের কোন বিচার চলবে না। তাদের নাকি আমেরিকান আদালতে বিচার হবে। এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শাহ সরকারের রাজনৈতিক সখ্যতা এত বেশী ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে শাহ ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে দহরম-মহরম ও ভাল ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে। ইরানের জনগণ দখলদার ইসরাইলী সরকারকে গভীরভাবে ঘৃণা ও দখলীকৃত প্যালেস্টাইনের মুসলমান ভাইদের সমর্থন করলেও শাহ সরকার বঞ্চিত জনতার শ্রমে উৎপাদিত সকল ক্ষমতা ইহুদীবাদীদের সমর্থনে ব্যবহার করে। বর্ণবাদী রোডেশীয় সরকার, ঔপনিবেশিক ও ক্ষমতা দখলকারী দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইনে পরনির্ভরশীল মার্কোস সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ইরানীদের তীব্র ঘৃণা থাকলেও এদের

www.pathagar.com

সাথেই ছিল শাহ সরকারের ভাল সম্পর্ক। শাহ এদের কাছে তেল বিক্রি করত, এদের দিত আর্থিক সাহায্য, রাজনৈতিক সমর্থন, বঞ্চিত দেশসমূহের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রে শামিল হত, এদের সাথে করত সহযোগিতা।

পাহলভী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি উত্তরের প্রতিবেশী সোভিয়েত ইউনিয়নকে সন্তুষ্ট করতে চাইত। ইরানী জনগণের সম্পদ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেয়া হয় এবং সে দেশের সাথে সম্পাদিত হয় কয়েকটি ঔপনিবেশিক চুক্তি। ভাড়াটে শাহ পশ্চিমা শিবির ও পূর্ব শিবিরকে ইরানের সম্পদ লুট করতে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার পশ্চিমা মিত্ররা ইরানের তেল সম্পদ লুট করে, রাশিয়া নেয় ইরানের প্রাকৃতিক গ্যাস, রাশিয়া তার আশ্রিত দেশে-গুলোকে উৎসাহ যোগায় ইরানকে শিল্প ও কৃষিতে আরো নির্ভরশীল করে তোলার কাজে হাত মেলাতে।

ইরানের অভ্যন্তরে শাহ জনগণের জন্য একটি ভিন্ন ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করে। তার প্রচার মাধ্যম ঘোষণা করে যে, সে পূর্ব ও পশ্চিম, উভয়ের সাথেই ভাল সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। শাহ-ই ছিল তার রাজতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা ও "স্বাধীনতা"। দেশের সম্পদ ও স্বাধীনতাকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভাগ করে দেয়া সত্ত্বেও 'ক্ষমতা ও স্বাধীনতা, থেকে শাহ "অলৌকিক" ঘটনাই ঘটিয়েছিল। "স্থিতিশীল দ্বীপ"-এ শব্দটি ইরানী জনগণের মানসিকতার ওপর ছাপ মেরে দেয়া হয়।

উপনিবেশবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইরান নিশ্চয়ই "স্থিতিশীল দ্বীপ" ছিল। কারণ তারা সহজেই সম্পদ লুট করতে পারত। শাহ কেবল তাদের জন্যে সুযোগ-সুবিধাই তৈরী করেনি, দুনিয়া লুটে নেয়া বৃহৎ শক্তিদের পক্ষে এ অঞ্চলের নিরাপত্তাও রক্ষা করত ভালভাবে।

কিন্তু 'স্থিতিশীল দ্বীপ" এক ঝঞ্ঝার সামনে দাঁড়িয়েছিল। এ ঝঞ্ঝা তৈরী করেছিল দেশের মুসলমান জনগণের আর্তনাদ ও হুংকার, যা অবশেষে "পাহারাদার" ও তার প্রভুদের পারস্য উপসাগরে নিক্ষেপ করে।

স্বাধীনতা দমন-পীড়ন

ইরানের জনগণ শাহ সরকারের সকল অপরাধ ও কুকর্মের মুখে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারল না। ইরানী জনগণ ইসলামী সংস্কৃতির বিকৃতি নীরবে মেনে নিতে পারল না। তারা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে দেশের ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরশীলতা দেখে শাহের ভাড়াটে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারল না।

www.pathagar.com

রেজা খানের সময় থেকে পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সে সময়ে ইমাম খোমেনী কাশফুল-আসরার—গোপন বিষয় ফাঁস—বই প্রকাশ করেন। রেজা খানের সরকারের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে বইটি রচিত হয়। ইমাম খোমেনী সে সময় মনে করেননি যে, রেজা খান সিংহাসন পেতে পারে এবং তখন থেকে তিনি রাজতন্ত্র উৎখাতের সংকল্প নেন।

১৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপক সংগ্রামের উপযুক্ত পরিস্থিতি ছিল না। ইমাম খোমেনী পাহলভী শাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্টবাদী অবস্থান গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জঙ্গী কর্মীরা সাধারণত আইনের কাঠামোর মধ্যে কাজ করত। ইমাম খোমেনীর সংগ্রামের পূর্বে জঙ্গী কর্মীরা শাসকগোষ্ঠীকে দেশের আইন মেনে চলতে বাধ্য করানোর চেষ্টা করত। তারা সরকার উৎখাতে আগ্রহী ছিল না। এ ধারণা ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু জঙ্গী কর্মীর মনোভঙ্গীতে বাধা হয়ে দেখা দেয়। এমনকি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরেও যখন ঐ ধারণা ভুল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হল, তখনও সংগ্রামের দীর্ঘ ও উত্তম অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট কিছু রাজনীতিবিদ ঐভাবে চিন্তা করা অব্যাহত রাখেন। এদের মধ্যে ছিলেন "মুক্তি আন্দোলনে" অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ, যে "মুক্তি আন্দোলন" ইমামের নির্দেশে ইরানে নয় মাস ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। রাজতন্ত্র উৎখাতের প্রায় এক বছর পরে, ১৯৭৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর হামিদ আলগারের সাথে সাক্ষাৎকারে মেহদী বাজারগান বলেছিল ঃ "মুক্তি সংগ্রাম ও অন্যদের মতে নির্বাচন এক ঐশ্বরিক আশীর্বাদ। শাহ সরকার যখন অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কথা বলল, তখন তার চেয়ে ভাল আর কি হয়? এ প্রেক্ষিতে প্রথমে সরকারকে আমরা বলতে পারতাম, 'তোমার কথায় যদি তুমি সৎ হও এবং নির্বাচন অবাধ হয়, তাহলে আমাদেরকে একটি ক্লাব করতে দাও।' সরকার হয় অনুমতি দিত নতুবা দিত না। অনুমতি না দিলে আমরা বলতে পারতাম, 'তুমি মিথ্যা বলছ, তারা আমাদেরকে ক্লাব গড়ার অনুমতি দিলে আমরা বলতাম, 'হ্যাঁ, এবার নির্বাচন অবাধ হবে, আমাদেরকে প্রার্থী দিতে দাও।' আমাদের প্রার্থী দিলে জনতা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদীদের প্রার্থীদের ভোট দিত। তখন আমরা প্রার্থী নিয়ে কথা বলতে পারতাম।"

"আমরা কি চেয়েছিলাম? নির্বাচন হবে, যেখানে বিরোধী পক্ষ—ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, জাতীয়তাবাদীরা, মুক্তি আন্দোলন এবং এমন আরো দলের দশ বা বিশ জন মজলিসে যাবে। তারা যদি আমাদের ডেপুটিদের মজলিসে যেতে না দিত, তাহলে আমরা তাদের চরিত্র ফাঁস করে দিতাম। আমরা মিঃ কার্টার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বলতাম ঃ 'তোমাদের মানবাধিকার মিথ্যা কথা!' আমরা তাদেরকে

www.pathagar.com

বলতাম যে, তারা মিথ্যা বলেছে। তাদের হাতে ছিল একটি তুরুপের তাস। তারা বলেছিল, 'জনাব! আমরা স্বাধীনতা দিয়েছি'। আমাদের জাতি কিছু না বললে তারা দুনিয়ার লোকজনকে বলত: 'দেখ, আমাদের দেশের কিছু বলার নেই।' তখন আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম। সেটাই হতো চমৎকার সূচনা। যা শুরু হয়েছিল তার সাহায্যে একজন মানুষ সকল শক্তিশালী অবস্থান-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার, ইত্যাদি নিতে পারত। রাজতান্ত্রিক শাসনের শেষ মাসগুলোতে, যখন ইমাম খোমেনীর সংগ্রাম সফল প্রমাণিত হচ্ছে এবং শাসকগোষ্ঠীর উৎখাত ঘটাবে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, সে সময় জনাব বাজারগান এ ধারণা পোষণ করত। এমনকি বিপ্লবের বিজয়ের এক বছর পরেও সে ঐ ধারণাই মনের মধ্যে ধরে রেখেছিল।

মুক্তি আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে জনাব বাজারগান উল্লেখ করে যে, তারা একটি রাজনৈতিক দল ও সম্ভবতঃ ২০ জন মজলিস সদস্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। সে আরো বিশ্বাস করত যে, এভাবে তারা ইরানী জাতির জন্যে সংবাদপত্র ও বিচারের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে। এটাই ছিল ঐসব সংগ্রামীদের লক্ষ্য। ১৫ই খোরদাদের পূর্বে বহু সংগ্রামীর মধ্যে এ মনোভাব ছিল এবং পরে জাতীয়তাবাদীরা তা পোষণ করতে থাকে। কিন্তু ১৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থানের পরে ইরানের ধর্মীয় শক্তিসমূহ সংগ্রামকে রাজতন্ত্র উৎখাতের সংগ্রামে পরিচালিত করে। ১৫ই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানের পূর্বে ইমাম খোমেনীরও এই মনোভঙ্গী ছিল। ১৫ই খোরদাদ (১৯৬৩'র ৫ই জুন) ও ২২শে বাহমান (১৯৭৯'র ১১ই ফেব্রুয়ারী)-এর মধ্যবর্তী কারাজীবন ও নির্বাসনের দীর্ঘ সময়ে ইমাম খোমেনী ইরানী জাতির প্রতি বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজতন্ত্র উৎখাতের জন্যে প্রকাশ্য আহবান জানান।

গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল, শাহের গোয়েন্দা বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সাভাক কেবল সরকার উৎখাতের প্রবক্তাদেরই দমন, কারাগারে অত্যাচার করে হত্যা করত না, এমনকি রাজতন্ত্রের প্রভাব শিথিলকরণের আভাস দানকারী মুক্তি আন্দোলন সদস্যদেরও শক্ত হাতে শায়েস্তা করত। বিশেষতঃ ২৮শে খোরদাদের (১৯৫৩'র ১৯শে আগস্ট) অভ্যুত্থানের পরে সেন্সরশীপ এবং দমন-পীড়ন এত বেড়ে গেল যে, রাজতন্ত্রের অনুমোদিত আইনের মধ্যে থেকেও কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর সম্ভাবনা থাকল না। ইমাম খোমেনীর বই, ছবি বা প্রবন্ধ রাখা নিষিদ্ধ ছিল। যার কাছে এগুলো পাওয়া যেত, তার জন্যে ছিল মৃত্যুদণ্ড বা অত্যাচার ও দীর্ঘ কারাজীবন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ইরানের সকল অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লাখ-লাখ মানুষকে ভাষণদান, বই বা প্রবন্ধ লেখা বা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনীর বিবৃতি, ভাষণ, বই বা ছবি অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সামগ্রী বিতরণ করা শাহের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। এসব কাজে নিয়োজিত লোকদের সাভাক চরেরা কারাগারে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করত। ইসলামী আলেমরা কারাগারে বহু বছর অন্তরীণ থাকতেন। ছাত্র, তালাবা, বাজারী, শ্রমিক ও কেরানীরা শাহ'র কারাগারে মারা যেত বা পঙ্গু হয়ে পড়ত। আন্দোলনকারীদের স্বীকারোক্তি আদায়ে সাভাক চরদের বহু ধরনের পন্থা ছিল। এর মধ্যে ছিল মানসিক অত্যাচার। এর একটি অত্যাচার ছিল, বন্দীকে বলা হত যে, সে স্বীকারোক্তি না দিলে, তারই সামনে তার স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে ধর্ষণ করা হবে। সর্বত্র ছিল সাভাকের উপস্থিতি। শাহ সরকারের সেবার জন্যে লাখ-লাখ সাভাক চরকে বিপুল পরিমাণ বেতন দেয়া হত। বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, মসজিদ, রাস্তা, স্কুল, এমনকি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পরিবারের মধ্যে ছিল তাদের উপস্থিতি। মানুষ পরস্পরকে সামান্যই বিশ্বাস করত। এ-রকম অবস্থাতেই ইরানের মুসলমান জনগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে জেগে ওঠে, জান কোরবান করে, ৬০ হাজারের বেশী মানুষ শাহাদৎ বরণ করে, বিকলাঙ্গ হয় ১ লাখ এবং শাহের ফ্যাসিস্ট শাসনের ওপর বিজয় অর্জন করে।

ইরানী জনতা আড়াই হাজার বছর বয়সী এক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। এ রাজতন্ত্র সিআইএ এবং মোসাদের মত গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাহায্যে অনাচার ও দমন-পীড়ন ছাড়া জনগণকে আর কিছু দেয়নি। জনগণ নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পবিত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করে। যাতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতার অবসান হয়, এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে ইরানী জনগণ আল্লাহর শিক্ষার ভিত্তিতে একটি ইসলামী সরকার চেয়েছিল। একটি ইসলামী সরকারের অধীনে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারবে।

পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক কাজের জন্যে এক-একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধরন রয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করলে, তা সহজে ও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। একটি বিপ্লব সম্পাদনও এই নিয়ম-বহির্ভূত নয়, আজ পর্যন্ত কোন বিপ্লব এ নিয়মের বাইরে সম্পাদন হয়নি। একটি বিপ্লব নতুন মাপকাঠি নিয়ে আসে। এ জ্ঞান বিরাজিত পদ্ধতিকে নিখুঁত করতে সাহায্য করে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব এরই পাশাপাশি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মূসা, ঈসা ও ইসলামের পয়গম্বরের বিপ্লবসমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিপ্লব ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে তুলনীয় নয়।

www.pathagar.com

বিপ্লব সশস্ত্রভাবে সংঘটিত হয় অথবা বিশ্ব শক্তিবর্গের ওপর নির্ভর করে ঘটে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দীসমূহে সংঘটিত কোন বিপ্লবই এ দু'টি নিয়মের লংঘন করে সংঘটিত হয়নি। কোন বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রতর দেশসমূহ বিপ্লব শুরু করলে, সেসব দেশ সাধারণত ঐ বিশ্ব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সমর্থন গ্রহণ করে। সামরিক শক্তি ও পর্যাপ্ত সরঞ্জাম বিশিষ্ট বৃহত্তর দেশসমূহ ও রাজনৈতিক শিবিরগুলো বিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ বিপ্লব অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে বিজয় অর্জন করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো রাশিয়ার সমর্থনে বিপ্লব করেছে, যোগ দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে। কোন দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবির ছেড়ে পুঁজিবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছে পুঁজিবাদী শক্তির ওপর ভর করে। আর এটা করতে গিয়ে কড়াই থেকে লাফ দিয়েছে চুলায়। এসব বিপ্লব সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনলেও নিজেদের জনগণকে পাল্টাতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে আলজেরিয়ার উল্লেখ করা যায়। বিপ্লবী দেশসমূহের মধ্যে এ দেশটি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ফরাসী আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসার পরে আলজেরিয়া সমাজতন্ত্রমুখী পরিবর্তন আনে, আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাচ্য শিবিরের সাথে আদর্শগত কারণে এটা হয়। তথাপি, ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পরে এখনো আলজেরীয় জনতা ইসলামের প্রতি গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অতি প্রাথমিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। আলজেরিয়ায় চিঠিপত্রে যোগাযোগ, আমলতান্ত্রিক কাজ ও শিক্ষার সরকারী ভাষা ফরাসী; এখনো ফরাসী ভদ্রতা, নিয়ম-কানুন, আনুষ্ঠানিকতা ও সংস্কৃতি সে দেশের জনগণের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। অন্যান্য বিপ্লবের মত আলজেরীয় বিপ্লবও এক বৃহৎ শক্তি থেকে মুক্ত হতে আরেক বৃহৎ শক্তির ওপর নির্ভর করেছিল বলেই এমন হয়েছে। এ বিপ্লবের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে নয়।

ইরানে ইরলামী বিপ্লব এসব পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে নির্ভর করেছে এমন এক পদ্ধতির ওপর, যে পদ্ধতির উদাহরণ আল্লাহর পয়গম্বরদের বিপ্লবে ছাড়া অন্য কোথাও নেই। বিশ্বের অন্যসব বিপ্লব থেকে এখানেই ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পার্থক্য। পয়গম্বরগণ অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, মানুষের অন্তর পরিবর্তনের জন্যে বিদ্রোহ করেছিলেন। আর অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও সাধিত হয় মানুষের মানসিক পরিবর্তন অনুসরণ করেই। এভাবেই ইসলামের নবী তাঁর বিপ্লব আনার জন্যে যেমন রোম বা পারস্যের ওপর নির্ভর করেননি, তেমনি ইরানের ইসলামী বিপ্লবও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হতে সমাজতন্ত্রের পদমূলে নিজেকে সমর্পণ করেনি।

www.pathagar.com

বিশ্বের জনগণ, বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিমা শিবিরের প্রধানরা, নাশকতামূলক সংগঠনসমূহের বুদ্ধিদাতা ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য যে, বিশ্বের এক নাম-গোত্রহীন কোন একটি জাতি অন্য বৃহৎ শক্তির কোলে আশ্রয় না নিয়েও আরেকটি বৃহৎ শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে, অস্ত্রশস্ত্রহীন এক বঞ্চিত জনতা বিদ্রোহ করে পরাজিত করেছে এক বৃহৎ শক্তিকে। বৃহৎ শক্তিবর্গ যখন বুঝল যে ইরানী জাতি তাদের আপোসহীন নেতা ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে মহান ইসলামী আন্দোলন "রাজাদের রাজার" শাসনের পতন না ঘটানো পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে সংকল্পবদ্ধ, তখন তারা জাতি থেকে নেতাকে বিচ্ছিন্ন করতে বা তাকে ও জনগণকে অন্য বৃহৎ শক্তিদের ওপর নির্ভর করানোর জন্যে রাজী করাতে বহু চেষ্টা চালায়। কিন্তু সবসময়ই উত্তর এসেছে "না"। মহান কোরানে বলা হয়েছে ঃ অন্যায়কারীদের দিকে ঝুঁকো না, আগুন তোমাকে স্পর্শ করুক, আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন রক্ষাকারী নেই, তুমি তাহলে তার সাহায্য পাবে (কোরান ১১ ঃ ১১৩)।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং তাদের সহযোগী ও দালালরা নিপীড়ক। তারা সকলেই বিশ্বের জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন, মানব জাতির সংস্কৃতি ধ্বংসে ইচ্ছুক ; এ উদ্দেশ্য সাধনে ইসলাম ও আল্লাহর বৈরী। পূর্ব বা পশ্চিম, দুনিয়ার সকল নিপীড়কই অত্যাচারী এবং মুসলমানরা তাদের কোন একটিকে দমনের জন্যে অপরটির সাথে বন্ধুত্ব করতে ও সাহায্য নিতে পারে না। প্যারিস ও নাজাফে অবস্থানকালে ইমাম খোমেনীর কাছে বৃহৎ শক্তিদের পক্ষ থেকে বহুবার বলা হয়, তিনি যেন তাদের সাহায্য নিয়ে সংগ্রাম চালান। কিন্তু বিপ্লবের নেতা সবসময়ই নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন, আর এভাবেই নিভিয়ে দিয়েছেন তাদের আশা। ইরানের অভ্যন্তরেও শাহ ও তার ভাড়াটে অনুচররা শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোস ও জনগণকে বর্জন করতে ইমাম খোমেনী ও তার সাথী যোদ্ধাদের রাজী করানোর জন্যে বহু চেষ্টা চালায়। কিন্তু সব সময়ই উত্তর এসেছে ঃ "ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জনগণের সেবা করা ছাড়া আমাদের কোন লক্ষ্য নেই। অবস্থান, উচ্চাকাংখা ও সম্পদের জন্যে জনগনকে ছেড়ে তোমাদের সাথে আপোস করা কিভাবে সম্ভব ?" নবীদেরও ধনী ও শক্তিমানরা বলত ঃ "দরিদ্র-বঞ্চিতদের ত্যাগ কর, তাহলে আমরা তোমাকে সমর্থন করতে পারি।" তাদের সে কথার জবাবে ইসলামের নবীও একই জবাব দিয়েছিলেন। নবী জবাব দিয়েছিলেন ঃ "দারিদ্র্য বা সঙ্কট বা পদের জন্যে আমরা কখনো বিশ্বাসীদের ত্যাগ করব না। তাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখব।" (কোরান, ২৬ ঃ ১১১-১১৪)।

www.pathagar.com

মানবতার শত্রুরা মানুষের মধ্যে শুভ প্রকৃতি দূরীকরণে অসংখ্য চেষ্টা করলেও ইরানের জনগণ শুভ প্রকৃতির কাছে ফিরে আসে। শত্রুরা চেষ্টা করেছিল জনগণকে প্রকৃত ইসলামী সংস্কৃতি থেকে দূরে টেনে নিতে। জনগণ ইমাম খোমেনীর নির্ধারক নেতৃত্বে বিশ্বাস করেছিল। খালি হাতে, কিন্তু আল্লাহর ওপর নির্ভর করে ইরানী জনগণ এমন এক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যে সরকার যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত ও আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত ছিল। জনগণ বিদ্রোহ করেছিল সে সরকারের দালালদের বিরুদ্ধে, বিজয় অবধি অব্যাহত রেখেছিল সংগ্রাম।

এ বৈশিষ্ট্যই ইরানে ইসলামী বিপ্লবকে অন্যান্য বিপ্লব থেকে পৃথক করেছে এবং এ বৈশিষ্ট্যই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। ইরানী জনগণ নেতার নির্দেশে সংগ্রাম শুরু করে। জ্ঞান, ধর্মীয় অবস্থান ও বিশ্বাসের কারণে এ নেতার অভূতপূর্ব প্রভাব রয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ ইমাম খোমেনীর ওপর আস্থার কারণে জনগণ সকল বিপ্লবী নির্দেশকে ধর্মীয় আদেশ হিসেবে মনে করে তা পালন করেছে।

ইসলামে উম্মত ও ইমামতের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নীতি। এ নীতি অনুসরণ না করলে ইসলামী আন্দোলনসমূহ টিকে থাকত না বা বিজয়ী হত না। যে জনগণকে বশীভূত করার জন্যে উপনিবেশ-বাদীরা ৫৭ বছর যাবত চেষ্টা করেছে, সে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে ইমামতের বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অদ্বিতীয় গতিময়তা। বৈষয়িক জীবনে আসক্ত এবং ইচ্ছা শক্তিহীন জনগণ বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে; বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যে জান-মাল উৎসর্গ করতে তারা বহু মাস ধরে চাকরি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে। বিপ্লবের সময়ে এবং বিপ্লবের বিজয়ের পর ইরানের জনগণ কোন সময়েই নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর দেয়নি। নেতৃত্বের নির্দেশ মানার জন্যেই তারা এটা করেছে। কোরানে এটাকেই বলা হয়েছে "ত্যাগ"। আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের বিষয় মানুষ কর্তৃক পুরোপুরি পরিত্যাজ্যের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে বৈষয়িকতা ও অবহেলার যুগ, সেই যুগে ইরানের মুসলমানরা মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে ত্যাগের সর্বোত্তম উদাহরণ তুলে ধরেছে; পুনরাবৃত্তি করেছে ইসলামের সূচনাকালের বীরত্বগাঁথা ও ত্যাগের ঘটনার। প্রথম যুগের মুসলমানরা তরবারি হাতে নিয়ে কাফের ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন বদর, হোনাইন ও কারবালায়। আর ইরানের মুসলিম জনগণ আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলে খালি হাতে মোকাবিলা করেছে কামান ও বন্দুকের। ১৩৪২-এর ৯৫ই খোরদাদে (১৯৬৩'র ৫ই জুন) ৯৫

www.pathagar.com

হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়, ১৩৫৭-এর ১৭ই শাহরিভারে (১৯৭৮'র ৮ই সেপ্টেম্বর) ৪ হাজার মুসলমান জীবন দেন। তারা জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, রক্ত সবসময়ই তরবারিকে পরাজিত করে।

ইরানী জনগণের ব্যাপক আন্দোলন যখন হয়, সে সময় কোন সুসংহত ইসলামী সংগঠন ছিল না। বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না কোন প্রকাশনা সংস্থা বা বেতার কেন্দ্র। জনগণ ও নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ক্যাসেটে ধারণকৃত বাণী। এসব ক্যাসেটে ইসলামের ঘোষণা ও বিবৃতিসমূহ ধারণ করা হত। বিভিন্ন ইসলামী উপদলের অবশিষ্টাংশ ছিল যে আধা-সংগঠিত শক্তি, তাদের সাহায্যে এসব টেপে ধারণকৃত বাণী জনগণের কাছে যেত। এভাবেই নেতা ও জনগণের মধ্যে সূচিত হয় সংযোগ।

পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক মহলসমূহ বৈষয়িক উপাদান অনুসারে প্রতিদিনই ইরান সম্পর্কে নিত্যনতুন মূল্যায়ন ও পূর্বাভাস করত। তবে এসব মূল্যায়নে নেতার অবিস্মরণীয় আধ্যাত্মিক প্রভাব ও তার নেতৃত্বের ওপর জনগণের গভীর বিশ্বাসের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত হত না, সাম্রাজ্যবাদীরা ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পুরোপুরি ভুলভাবে বিচার করে। বি,বি,সি, ভয়েস অব আমেরিকা ও ভয়েস অব ইসরাইলের মত বিদেশী ও ঔপনিবেশিক বেতার কেন্দ্রগুলো সদা-সর্বদা ধ্বংস ও হতাশার কথা আগাম প্রচার করত। এমনকি, ইরানে বিপ্লবের সম্ভাবনায় আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে রেডিও মস্কোর, সেই বেতার কেন্দ্রটিও ইরান সম্পর্কে নিজেদের মূল্যায়নে কখনো চূড়ান্ত ফলাফলের কথা উল্লেখ করত না। একটি রুশ সীমান্তবর্তী দেশ থেকে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বহিষ্কৃত হলে এই অঞ্চলে আমেরিকান প্রভাব খর্বিত হত। এ দেশেটিতেই আমেরিকা ব্যাপক গোয়েন্দা ও সামরিক সুবিধা পাচ্ছিল। এমনকি, যে ৯৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থানের সময় শাহ সরকার ইরানের মুসলমান জনগণের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতম কাজকর্ম চালিয়েছিল, সেই গণ-অভ্যুত্থানকে রেডিও মস্কো প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করেছিল। বৃহৎ শক্তিবর্গের মানবতা বিরোধী অবস্থানের কারণেই যে এসব বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করা হত, তাতে কোন মিথ্যা নেই; সেই সাথে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে এসব কাজকর্ম ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃতি অনুধাবনে তাদের অক্ষমতারও প্রকাশ।

এটা নিশ্চিত যে, উপনিবেশবাদ ও নিপীড়নের শিকার দেশসমূহ, বিশেষতঃ মুসলিম দেশসমূহকে বিশ্ব নিপীড়কদের নখর থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। প্রচলিত বিপ্লবী পন্থা বর্জন করে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পন্থা গ্রহণ করলেই কেবল এসব দেশ সফল হবে। সে পদ্ধতি হচ্ছে ঃ বিশ্ব শক্তিবর্গকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা এবং সমগ্র জাতির দৃঢ়সংকল্প। এতে কোন সন্দেহ

www.pathagar.com

নেই যে, শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করলে সকলে জাতির বিজয় নিশ্চিত হবে এবং সকল বিশ্ব-নিপীড়কের, তা পূর্ব বা পশ্চিমের হোক না কেন, মানবতা বিরোধী আধিপত্যের অবসান ঘটবে।

বিপ্লবী শক্তিসমূহ

ইরানের ইসলামী বিপ্লবসহ প্রতিটি বিপ্লবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংগঠন। কোন ছুরি দিয়ে যেমন চিকিৎসক মানব দেহের কোন নষ্ট অঙ্গ কেটে বাদ দেন বা কোন অপরাধী কোন স্বাস্থ্যবান লোকের পেট কাটতে ব্যবহার করে একই ছুরি, ঠিক তেমনি সংগঠনও ভাল বা খারাপ হতে পারে। সংগঠনের অনুসৃত উদ্দেশ্যই এ সংগঠনের কার্যকারিতা বা মূল্যহীনতা নির্ধারণ করে।

ইসলামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মুসলমানরা একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংগঠন কামনা করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এসব চেষ্টা কদাচিৎ সুফল বয়ে এনেছে। এ ধরনের সংগঠন না থাকা ইসলামী আন্দোলনসমূহ পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ। কারবালায় ইমাম হোসেন (আঃ) ও তাঁর সাথীদের শাহাদৎ বরণের ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের নিপীড়ন ও দুর্নীতির অবসান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের নিপীড়ক শাসন অব্যাহত থাকে। আমরা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে আলাভী আন্দোলন, কাজার রাজবংশের বিরুদ্ধে সংবিধান আন্দোলন, পাহলভী শাসনের বিরুদ্ধে রুহানিয়াৎ আন্দোলনসহ অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে পরাজিত হতে দেখি। এর কারণ, এসব আন্দোলনে একটি সমন্বিত ইসলামী সংগঠন ছিল না। সব সময়ই নিষ্পাপের রক্ত ঝরেছে এবং রক্ত উৎসর্গকারীর সাথে যাদের কাজের মিল ছিল না, তারাই শাহাদতের ফলে সৃষ্ট সুবিধা নিয়েছে ও নিজের পথে এগিয়েছে।

এ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে রুহানিয়াৎ (ধর্মীয় নেতা) উপলব্ধি করেন যে, প্রতিটি বিপ্লব অব্যাহত রাখার জন্যে সকল আন্দোলনকে সমন্বিত করতে হবে, একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে চালাতে হবে সকল তৎপরতা। সংগ্রামের সূচনা থেকে বিপ্লবের বিজয় অবধি, সমগ্র পর্যায়ে এ চিন্তাটি ইরানের সকল ধর্মীয় নেতার মধ্যে ছিল। এমনকি সাম্প্রতিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেও জঙ্গী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ ধরনের চিন্তার সুস্পষ্ট নজীর হচ্ছে ফেদাইন-ই-ইসলাম সংগঠন।

এ ধরনের সংগঠন গঠনে ফেদাইন-ই-ইসলাম নেতৃবৃন্দ জঙ্গল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। ঐ জঙ্গল আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর্জা কৌচাক খান জংগলী নামে একজন ধর্মীয় নেতা। কিন্তু একটি সুসংহত

www.pathagar.com

সংগঠনের অভাবে ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ফেদাইন-ই-ইসলাম ও জাতীয় আন্দোলনের পরাজয় প্রমাণ করে যে, লক্ষ্য অর্জনে, ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় ও ইসলামী সরকার টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন একটি ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী সংগঠন।

শাহ সরকারের দমনমূলক বছরগুলোতে এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য ছিল না। শাহ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রকৃত ইসলামী শক্তিসমূহ কেবল আধা- সংগঠনই প্রতিষ্ঠা করতে পারত।

দুই প্রবণতা

বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কয়েকটি সংগঠন ইরানে সক্রিয় ছিল। যেসব প্রকৃত ইসলামী সংগঠন সক্রিয় ছিল, সেগুলোর ছিল না কোন কেন্দ্রীয় কাঠামো। অনৈসলামিক এবং কিছু ইসলামী সংগঠন একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছিল না। ইসলামপন্থী শেষোক্ত সংগঠনগুলোর স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম ছিল জাতীয়তাবাদী। এসব সংগঠন শর্তসাপেক্ষে পাহলভী সরকারের সাথে আপোস করতে ইচ্ছুক ছিল। শর্ত হিসেবে অবাধ নির্বাচন এবং জাতীয় পরামর্শক সভায় কয়েকজন সদস্য নির্বাচনের সুযোগ। অনৈস-লামিক, এমনকি ইসলাম বিরোধী চরিত্র এবং ইরানের ইতিহাসের গত ৫০ বছরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ-কর্মের জন্যে ইরানের তুদেহ পার্টিকে ঐসব দলের সাথে, যাদের সংগ্রাম ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ছিল না, তুলনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু এসব সংগঠনের পূর্ব বা পশ্চিম প্রীতি এবং আদর্শগত ও রাজনৈতিক ঝোঁক ও প্রবণতার ভিত্তিতে বলা যায়, এগুলোর সাথে তুদেহ পার্টির সাযুজ্য ছিল। এসব সংগঠনকে ইরানের ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি সংগঠিত ও সমন্বিত প্রবণতা বলা যায়।

এসব সংগঠনের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। তবে অভিন্ন লক্ষ্যের কারণে এগুলোকে একটি প্রবণতা হিসেবে গণ্য করা যায়। এই অভিন্ন লক্ষ্যটি হচ্ছে, তুদেহ পার্টি থেকে শুরু করে জাতীয় ফ্রন্ট ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল এবং এখনো করছে। এ সরকার পশ্চিমা বা পূর্ব, যে চিন্তা অনুসারেই গঠিত হোক না কেন, সে সরকার হত ইসলামী সরকার থেকে পৃথক এবং ঐ ধরনের সরকার ইসলাম পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় ফ্রন্টের শরীক অধিকাংশ সংগঠন মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা তুদেহ পার্টির আদর্শেই বিশ্বাস করে। পূর্ব শিবিরের গণতান্ত্রিক ধরনের বিশ্বাসীদের সংখ্যাই এ ফ্রন্টে বেশী।

www.pathagar.com

জাতীয় ফ্রন্ট ও তুদেহ পার্টি, দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন। তবে প্রথমে এরা পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। জাতীয় ফ্রন্ট পশ্চিম মুখো আর তুদের পার্টি মার্কসীয় আদর্শের দিকে ঝোঁকে। এ দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর একটি ইরানকে পশ্চিমের ওপর, অপরটি পূর্বের ওপর নির্ভরশীল করার চেষ্টা করেছিল। উভয়ই ইরানী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

তুদেহ পার্টি ১৩৩২-এর ২৮শে মোরদাদের (১৯৫৩-এর ৯৯শে আগষ্টে) এবং জাতীয় ফ্রন্ট ১৯৭৮-এ শাপুর বখতিয়ারের মাধ্যমে ১। মুক্তি ফ্রন্টের নেতা মেহেদী বাজারগানের সাক্ষাৎকার ২। ১৩৫৭-এর ফারভারদিনে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী গণভোটের সময় মেহেদী বাজারগান ঘোষণা করে যে, সে ইসলামী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চায়। জাতীয় ফ্রন্ট অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের চূড়ান্ত দিনগুলোতে শাপুর বখতিয়ার জনতার সৃষ্ট বিপ্লবী সরকারের প্রতি ছিল বৈরী।

সুনির্দিষ্ট আদর্শের অভাবে জাতীয় ফ্রেন্ট ছিল বিভক্তি। এ দিক থেকে জাতীয় ফ্রন্টকে "আদর্শহীন" ফ্রন্ট বলা যায়।

জাতীয় ফ্রন্ট আন্দোলন থেকেই ১৯৬৩তে গঠিত হয় "ইরানের মুক্তি আন্দোলন"। মুক্তি আন্দোলনের আদর্শের ভিত্তি ছিল ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ। কিন্তু যেহেতু এর অধিকাংশ নেতা ছিল পশ্চিমা শিক্ষিত এবং তাদের ইসলাম ছিল পশ্চিমা ধাঁচের, তাই পুরোপুরি ইসলামী সংগঠন হিসেবে কাজ করা এ আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এছাড়াও, জাতীয় ফ্রন্ট আন্দোলন থেকে পাওয়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ইসলামী চিন্তা সংহত করার ক্ষেত্রে মুক্তি আন্দোলন নেতৃবৃন্দকে বাধা দেয়।

মুক্তি আন্দোলনের কোন নেতাই আইন বিশারদ ছিলেন না। এ পরিস্থিতির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ ও পশ্চিমা আসক্তির ফলে এ সংগঠনটি প্রকৃত ইসলামী সংগঠনে রূপ নিতে পারেনি।

ইরানের মুক্তি আন্দোলনে পশ্চিমা প্রবণতার ফলে একদল বিপ্লবী যুবক ১৯৬৫ সালে এ সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসে; এ ঘটনা ঘটে ৯৫ই খোরদাদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের ২ বছর পরে। সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করে এ যুবকরা মুজাহেদীন-ই-খাল্‌ক নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এ সংগঠন আদর্শগত ঘাটতির কারণে মার্কসবাদী ও মাওবাদী শিবিরে আশ্রয় নেয়। অবশ্য ইসলামী চরিত্র বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সত্ত্বেও তারা মার্কসবাদী ফাঁদে পড়ে। কয়েক বছর এ বিচ্যুতি আড়াল করার পরে তারা ১৯৭৫ সালে এ কথা স্বীকারে বাধ্য হয়। মার্কসবাদী আদর্শ গ্রহণ না করার জন্য এ সংগঠনের প্রধানরা কয়েকজন সদস্যের প্রাণবধ করে। এ সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কিছু সদস্য।

www.pathagar.com

সংগঠনটির ভেতরেই দেখা দেয় কিছু উপদল। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদী গ্রুপ জন্মায়। মুজাহেদীন-ই-খাল্‌ক-এর রণনীতি হচ্ছে ঃ মুসলমান যুবকদের দলে টানতে সংগঠন নিজেকে ইসলামী বলে জাহির করবে। এরপরে সংগঠনের মার্কসবাদী শাখায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্যে ঐ যুবকদের মগজ ধোলাই করবে।

মুজাহেদীন-ই-খাল্‌ক সংগঠন সৃষ্টির সাথে সাথে ফেদাইন-ই-খাল্‌ক নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এ সংগঠনের আদর্শ ছিল তুদেহ পার্টি'রই আদর্শ, অর্থাৎ মার্কসবাদী আদর্শ। এ সংগঠনের মধ্যেও দেখা দেয় বিভক্তি। তবে তুদেহ পার্টি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে যে কাজ করতে পারত না, এ সংগঠন সে কাজ করে।[১] বর্তমানে ফেদাইন-ই-খাল্‌ক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ট, এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ চালায়। প্রথমোক্ত অংশটি তুদেহ পার্টি'র অনুরূপ অবস্থান গ্রহণ করে ও ঐ দলের সাথে সহযোগিতা করে, শেষোক্তটি ঐ অবস্থান মেনে নেয় না এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করে। তবে মনে হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও তুদেহ পার্টি'র সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সম্পর্ক মুজাহেদীন-ই-খাল্‌কের সাথে তার শাখাগুলোর সম্পর্কের মতই। জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও পশ্চিমা প্রবণতা বিশিষ্ট জাতীয় ফ্রন্ট আন্দোলনে বিভক্তি দেখা দেয়, সৃষ্টি হয় কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দল। এসব দলে পশ্চিমা প্রবণতা খুব বেশী; শাহ সরকার, বৃটেন ও আমেরিকার সাথেও সখ্যতা প্রচুর।

আমরা দেখি যে, জাতীয় ফ্রন্ট আন্দোলন পশ্চিমা এবং মার্কসবাদী ও মাওবাদী চিন্তার ওপর নির্ভরশীল দল ও সংগঠন তৈরী করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর সাথে তুদেহ পার্টি'র কোন বিরোধ ছিল না। এটা ঠিক যে, ইরানের মুক্তি আন্দোলন মার্কসবাদী ছিল না, পশ্চিমা পন্থীও ছিল না। তবে এটার মধ্যে ছিল প্রবল পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী এবং এ সংগঠনটি জাতীয় ফ্রন্ট আন্দোলনের সন্তান, মুজাহেদীন-ই-খাল্‌কের জননী, এম কে ও থেকে বেরিয়ে আসা ছোট-ছোট মার্কসবাদী উপদলের মাতামহ। এসব দল পশ্চিমা বা পূর্ব বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকার সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও এখন এ সবগুলোই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার মুখে তুদেহ পার্টি'র আপাত শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিছক কৌশল। তুদেহ পার্টি'র সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য বিরোধী সংগঠনের, এমনকি পশ্চিমা উদারপন্থীদের সংযোগের প্রমাণ রয়েছে। এ থেকে এটা সন্দেহাতীত যে; এ দলটি প্রথম ধারার ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী শরীক।

১। বিপ্লবের বিজয়ের পরে ফেদাইন-ই-খাল্‌ক কুর্দীস্তানে আমেরিকার পদলেহী ও মুজাহেদীন-ই-খালকের সাথে সহযোগিতা করে। এদের সাথে মিলে তারা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য চক্রান্ত করে এবং ১৯৫১ ও '৫৩ সালে তুদেহ পার্টি'র মতই আচরণ করে।

www.pathagar.com

বিপ্লবীকরণ প্রবণতা

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক শতাব্দী আগে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ শুরু করেছিলেন এক সংগ্রাম। তারা ইসলামী শাসন কায়েমের আহবান জানিয়েছিলেন। সে সংগ্রাম ছিল রাজতন্ত্রের এবং ইরাকসহ অন্যান্য দেশের স্বেচ্চাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম জিলানের ধর্মশাস্ত্রের ছাত্র মীর্জা কৌচাক খানের নেতৃত্বে জঙ্গল আন্দোলনে রূপ নিয়ে কাজার রাজবংশের শেষ সময় পর্যন্ত চলে। মীর্জা কৌচাক খান কোমের ধর্ম স্কুলগুলোতে অধ্যয়ন করেন। সৈয়দ জামাল অদ-দীন, মীর্জা শিরাজীসহ অন্যান্য উলামার সংগ্রামকে একটি নবপর্যায়ে উন্নীত করেন কৌচাক খান। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও ইসলামী সরকার কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত সংবিধান আন্দোলন এ ধারারই ধারাবাহিক রূপ। উপনিবেশবাদের চররা এ আন্দোলনকে বিচ্যুত করে এবং প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা দেয়। ইসলামী সংবিধান ও ইসলামী পরামর্শক সভার দাবী উত্থাপনকারী শেখ ফজলুল্লাহ নূরীকে তারা ফাঁসিতে ঝোলায়। সংবিধান আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ইসলামী শাসনে বিশ্বাসী শক্তিসমূহ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ একটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম সংবিধান রচনার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ধর্মতত্ত্বের আরেকজন ছাত্র সৈয়দ মুজতবা নাভভাব সাফাবির নেতৃত্বে ফেদাইন-ই-ইসলাম গঠন ঐ লক্ষ্য পূরণেরই উদাহরণ। পাহলভী শাসনের বিরুদ্ধে ফেদাইন-ই-ইসলাম ও আয়াতুল্লাহ কাশানীর পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ইসলামী শক্তি আরেকটি প্রকৃত শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেন। ১৯৬১ সালে ইসলামী ন্যাশনস্ পার্টি ও ইউনাইটেড ইসলামিক গ্রুপস্ গঠন এ চিন্তারই বাস্তব ফসল। এ সংগঠন দু'টি পাহলভী শাসনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামে জণগণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা রাখে। এসব গ্রুপ ১৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ ঘটনা প্রকৃত ইসলামী সংগঠন বা সংগঠনসমূহের প্রয়োজন তুলে ধরে। যেমন হয়েছিল মুজাহেদীন-ই-খালকের বেলায়। তবে সত্য এটাই যে, এসব গ্রুপের কেউই জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লব ঘটাতে পারত না। গত অর্ধ শতকে প্রথম ধারাটি গণআস্থা প্রাপ্তিতে বা জনগণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি অক্ষম প্রমাণিত হয়। ১৯৫৩-র ১৯শে আগস্ট তুদেহ পর্টি'র সহযোগিতায় সংঘটিত অভ্যুত্থানের পরে ইরানীরা এ দলকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করত। পাহলভী সরকার তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছিল বলেই যে তারা ১৯৫৩'র

www.pathagar.com

১৯শে আগস্ট থেকে বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত বিদেশে ছিল, কারণ তা নয়। তাদের বিদেশ থাকার কারণ, ইরানের জনগণ তাদের পছন্দ করত না। পাহলভী সরকার যে তুদেহ পার্টির নেতাদের অপছন্দ করত না, তার প্রমাণ হচ্ছে, ঐ দলের কিছু নেতা মুহাম্মদ রেজার শাসনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সরকারে এবং রেডিও-টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিল। তারা এমনকি শাহর সাথে এবং শাহর রাসতাখিজ দলের সাথে সহযোগিতা করত। প্রকৃতপক্ষে, এ অপরাধের কারণেই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আদালতে তাদের শাস্তি দেয়া হয়।

জনগণের মধ্যে ইরানের জাতীয় ফ্রন্টের কোন অবস্থান ছিল না। শাহের সাথে ফ্রন্টের সহযোগিতা ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে এটা পরিস্ফুট। শাহের সাথে সহযোগিতাই ফ্রন্টের প্রকৃত চেহারা জনগণের কাছে উন্মোচন করেছে। তাই একথা বল্লে মিথ্যা হবে না যে, শাহ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সমবেত করতে এ ফ্রন্টের কোন ভূমিকা ছিল না।

প্রথম ধারার অনুসারী ইরানের মুক্তি আন্দোলন, মুজাহেদীন-ই-খালক ও অন্যান্য সংগঠন ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত ক্ষণে (১৯৭৮-৭৯র মধ্যে) ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনুসৃত সংগ্রামের পন্থার বিরোধিতা করেছিল। তারা কেবল মনেই করত না যে, এ পন্থায় বিপ্লব হবে না। সেই সাথে তারা আরো মনে করত যে, এ পন্থায় শক্তির অপচয় হবে এবং কার্যতঃ সমগ্র আন্দোলন হবে পরাজিত। মুক্তি আন্দোলনের প্রধানদের অনুসৃত শ্লোগানটি ছিল ঃ শাহ রাজা হবে, কিন্তু শাসক হবে না। মুক্তি আন্দোলনের নেতা বিপ্লবের বিজয়ের প্রায় এক বছর পরও, ১৯৭৯-র ডিসেম্বরে হামিদ আলগরের সাথে সাক্ষাৎকারে একথাই বলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ইরানের জনগণ স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শ্লোগান বর্জনে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ এজন্যেই তারা জান কোরবান করেছে। তাই জনগণ মুক্তি আন্দোলনের শ্লোগান গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৭৭ ও '৭৮-এ মুজাহেদীন-ই-খালক কয়েকবার ঘোষণা করে যে, তারা শাহের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনুসৃত পন্থা সমর্থন করে না, এ পন্থার বদলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা উচিত।

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ধর্মীয় নেতৃবর্গের গৃহীত পন্থাটি ছিল গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘট। মুক্তি আন্দোলন বা মুজাহেদীন-ই-খালক, কারো কাছেই এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে এই পন্থাই বিপ্লব এনেছিল। জনগণকে সমবেত করার ক্ষেত্রে প্রথম ধারার অনুসারী শক্তিসমূহের কোন ভূমিকাই ছিল না। কেবল তা-ই নয়, তারা এমনকি জনগণকে বিপ্লব থেকে পৃথক করার এবং প্রকৃত ইসলামের পথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়ারও চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

সংগ্রামের পন্থা দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে প্রথম ধারাটি বিপ্লবের সাথে মতানৈক্য পোষণ করে বলে মনে করলে ভুল হবে। এ ধারাটি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বিপ্লবের বিজয় চায়নি। এটাই হচ্ছে সত্য ঘটনা। তাই যাতে উপযুক্ত সময়ে নেতৃত্ব নিতে পারে, সেজন্যে তারা বিভিন্ন অজুহাতে বিপ্লবের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু যাই হোক, রাস্তায় নেমে আসা, জীবন উৎসর্গকারী ইসলাম অনুরাগী জনগণই বিপ্লব ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় ধারাই জনগণকে সমবেত, সংগঠিত ও নেতৃত্বের সাথে গ্রথিত করেছিল। এ ধারার সংগঠকরা হচ্ছেন জঙ্গী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তি, এঁরা ইমাম খোমেনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে শাহ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এখন তারা প্রকৃত ইসলাম ও ইমাম খোমেনীর পথে বিপ্লবের প্রকৃত অনুসারী।

পরাস্ত চক্রান্ত

১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিকরা যখন বুঝতে পারল যে, পাহলভী রাজবংশের পতন এবং বিপ্লবের বিজয় হবেই, তখন থেকে তারা প্রথম ধারা, বিশেষতঃ জাতীয় ফ্রন্টের প্রধানদের সম্পর্কে প্রচারণায় মনোনিবেশ করে। সে সময়ে ইরানের প্রচুর লোক বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও ভয়েস অব ইসরাইল শুনত। এসব বেতার কেন্দ্রে জাতীয় ফ্রন্ট, অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিকদের ওপর বেশী করে আলোকপাত করা শুরু করে। এসব নেতৃবৃন্দ বিপ্লবকে বিঘ্নিত করতে চেয়েছিল। ঐ বেতার কেন্দ্রগুলো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে একটি শব্দ উচ্চারণ না করতেও চেষ্টা করত। কারণ উদারনৈতিক নেতাদের "পশ্চিমা আসক্ত" অবস্থানকে নিরুপদ্রব করাই ছিল বেতার কেন্দ্রগুলোর উদ্দেশ্য। উদারনৈতিক নেতারা একদিকে ছিলেন ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে, অপরদিকে তারা জঙ্গী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে দুর্বল করতে এবং বিশ্বের কাছে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বকে বেঠিকভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। উপনিবেশবাদীরা সাব্যস্ত করেছিল যে, পাশ্চাত্য ঝোঁকা নেতাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচার হলে বিপ্লবের নেতৃত্ব এসে পড়বে ঐ পাশ্চাত্য ঝোঁকা নেতাদের হাতে, নইলে অন্ততঃপক্ষে বিপ্লবের নেতৃত্ব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও উদারনৈতিকদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর এরই ফলে প্রকৃত ইসলামী বিপ্লবের আগমন রোধ করা সম্ভব হবে। এর পরে, পশ্চিমের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা নেতারা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ইরানে প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করবে।

জনগণের ওপর ধর্মীয় নেতৃবর্গের বিপুল প্রভাব, ইমাম খোমেনীর নজীরবিহীন নেতৃত্ব এবং তাঁর ওপরে জনগণের নির্ভরশীলতার কারণে ইরান সম্পর্কে এসব ধারণা

www.pathagar.com

ভুল প্রমাণিত হয়। তাই পশ্চিমা উদারনৈতিকদের সমর্থনে ঔপনিবেশিক বেতার কেন্দ্রগুলোর সম্প্রচার জনগণের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। উপনিবেশ-বাদীদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হিসেবনিকেশের বিপরীতে ইরানের জনগণ ইমাম খোমেনীকে সর্বদা নিজেদের মূল্যায়নে দিক-নির্দেশক হিসেবে মেনে চলে। কোন ব্যক্তি বা বস্তু ইমাম খোমেনীর পথ থেকে কতটুকু দূরে, তা দিয়ে ইরানী জনগণ বিচার করে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু ভাল কি মন্দ। কারণ ইরানের জনগণের কাছে ইমাম খোমেনী বিশুদ্ধতা, সততা, ত্যাগ এবং ইসলামী ও মানবীয় গুণাবলীর প্রতীক। যদিও পাশ্চাত্যের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা লোকেরা ইমাম খোমেনীর পথ অনুসরণ করার ভান করেছিল, তথাপি ইরানীরা তাদের কথা বিশ্বাস করেনি বা করবে না। যদি কোনভাবে ইরানী জনগণ প্রতারিত হয়, তাহলে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সত্য অনুধাবন করবে এবং প্রতারককে বর্জন করবে। ইরানের প্রথম প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এমন ঘটনাই ঘটেছিল।

উপনিবেশবাদীদের গণমাধ্যমগুলোর চেষ্টা কোনভাবেই সফল হয়নি এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব ইমাম খোমেনীর হাতেই রয়ে যায় ও বিপ্লব ইসলামী পথে এগিয়ে চলে। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব দুর্বল করা এবং সে স্থলে জাতীয় ফ্রন্ট ও অন্যান্য পশ্চিমাপন্থীদের আসীন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমাপন্থী ব্যক্তিদের বড় করে দেখানোর জন্যে বিশ্ব শোষকদের প্রচারণা ব্যবস্থা পুরোপুরি পরাস্ত হয়। তবে এসব লোক এই প্রচারণার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ দেশের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখলে রেখে বিপ্লবের বিজয়ে শরীক হিসেবে নিজেদের জাহির করতে সক্ষম হয়। এভাবে তারা বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি করে। এ কারণেই বিদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের প্রতিনিধিরা ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। এছাড়াও, বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোতে দেশের ভেতরে, বিশেষতঃ প্রশাসনে প্রচুর বিশৃংখলা দেখা যায় এবং এই পশ্চিমাপন্থীরা ও ইসলামী সরকার বিরোধীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। আজো এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ে।

বিপ্লবের বিজয়ের পরে, রাজনীতির "প্রথম ধারাটি" দেশের ভেতরে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচারণার সুযোগ নিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তারাই বিপ্লবের সংগঠক, তাই তাদেরকেই শাসন চালানোর সুযোগ দেয়া উচিত। এ কারণেই ইমাম খোমেনী কয়েক বার ঘোষণা করেন যে, কোন গোষ্ঠী বা দল নয়, জনগণই এ বিপ্লবকে সফল করেছে। ইসলামী পরামর্শক পরিষদ গঠন প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৩৬০-এর ৬ই খোরদাদে (১৯৮১-এর ২৭শে মে) পরিষদ সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে ইমাম খোমেনী এ বক্তব্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, "উলামারাই বিক্ষোভের জন্য জনগণকে রাস্তায় ও বাজারে টেনে এনেছে এবং শাহাদৎ বরণের জন্যে জনগণকে উদ্দীপিত করেছে ইসলাম। কোন ফ্রন্ট,

www.pathagar.com

কোন দল বা গোষ্ঠী জনগণকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে, শাহাদতের পথে এগিয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেনি।"

স্পষ্টতঃই, ইমাম "প্রথম ধারার" শরীক 'জাতীয় ফ্রন্ট,' 'মুক্তি আন্দোলন,' 'মুজাহেদীন-ই-খাল্‌ক সংগঠন' সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠনের দাবীর জবাব দেন। এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কোন দল, ফ্রন্ট বা উপদল দাবী করতে পারবে না যে, তারা বিপ্লবের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বিপ্লবের গতি শ্লথ করা ছাড়া 'প্রথম ধারা' ভুক্ত ঐসব দলের কোন ভূমিকা নেই। তাই বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রেও নেই তাদের কোন ভূমিকা।

"দ্বিতীয় ধারার" শরীকরা গণ-আন্দোলনের ও নেতার সাথে জনগণের সংযোগ সাধনের প্রকৃত সংগঠক হলেও সবসময়ই নিজেদেরকে জনগণের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে, এখনও জনগণ তাদের বিশ্বাস করে। তারা কেবল মনেই করে না যে, বিপ্লবের কাছে তারা ঋণী, তারা এখনো গুরুভার বহন করে। বিপ্লবের বিজয়ের পরে এরাই ছিল জনগণকে সমবেত করার জন্যে নেতার প্রধান নির্ভর। জঙ্গী ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত এ দ্বিতীয় ধারাটি "ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দল" গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় ধারাটি সবসময়ই জনগণকে বিপ্লবের প্রকৃত মালিক হিসেবে মনে করেছে। যদিও দ্বিতীয় ধারাই বিপ্লবের প্রকৃত সংগঠক তথাপি তারা নিজেরা কখনো হিস্‌সা চায়নি। তারা দায়িত্ব পালনের জন্যে নিছক পরিচালনাকারী পদসমূহ গ্রহণ করে। এ পদ গ্রহণকে তারা ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করে। স্বদেশ ও বিদেশে বিরোধীরা প্রচার করলেও এরা কখনোই বিপ্লবে বিশ্বাসী মেধাবানদের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। বুদ্ধিবৃত্তিগত ও সাংস্কৃতিক কাজে যাতে মনোনিবেশ করতে পারে, সেজন্যে এদের অনেকে দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষমদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পদত্যাগ করে।

বিপ্লবী সরকার ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীলদের বর্জন করে কোন বিপ্লবী সরকার ব্যবস্থা দেশ চালাতে পারে না। ইরানের মত দেশে যেখানে অর্ধ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অবশিষ্টাংশ এখনো বহু প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছে, সেখানে একথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ ও বিদেশে তাদের প্রভুরা অভিযোগ করে যে, ইসলামী বিপ্লবীরা দেশের সরকারী সংস্থাগুলো একচেটিয়া ভাবে দখল করেছে। এসব প্রতিবিপ্লবী সরকারে প্রধান-প্রধান পদ চায়। প্রত্যেকেরই জানা আছে, এরকম হলে তা বিপ্লবের জন্যে কত বিপজ্জনক হবে।

বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্বেগ হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবকে রক্ষা করা। বিপ্লবীরা ক্ষমতালিপ্সু নয়, তারা সরকারী পদগুলো একচেটিয়াভাবে দখল করতেও চায় না।

www.pathagar.com

বিপ্লবের শক্তিসমূহের গঠন-প্রকৃতি

প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ ও উপনিবেশবাদীদের প্রচারণা ব্যবস্থা বিশ্বের জনগণকে বোঝাতে চায় যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব করেছে ধর্মীয় নেতারা এবং দেশের বুদ্ধিজীবীরা এ বিপ্লব সমর্থন করে না। এদের প্রচারণা এতই ব্যাপক যে, এতে বিদেশে ইসলামী বিপ্লবের বহু মিত্রও তা বিশ্বাস করে। স্পষ্ট এই, বিপ্লবকে দমনের উদ্দেশ্যে দেশের ভেতরে ও বিদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা এ ধরনের বিরূপ প্রচারণা চালায়। ইসলামী বিপ্লবকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা এবং অন্যান্য দেশে এ বিপ্লবের প্রসার রোধের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রতিবিপ্লবীদের।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সমাজের এক বা দু'টি স্তরে সীমিত নয়। এ বিপ্লবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ঃ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, কেরানী, দোকানদার, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা, বিদ্বজ্জন, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা অংশ নিয়েছে। নিরস্ত্র বিক্ষোভ ও মিছিলের মধ্য দিয়ে জনগণ আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত শাসক-গোষ্ঠীকে উৎখাতে সমর্থ হয়। তাহলে সমাজের দু-একটি অংশের দ্বারা এ বিপ্লব হয়েছে, এ কথা কি বলা যায় ? বিপ্লবের বিজয়ের ২৮ মাস পরে, ১৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থান উপলক্ষে যে মিছিল হয়েছিল সেটাই এর প্রমাণ। এ মিছিল ছিল বিপ্লবের বিজয়ের মিছিলগুলোর চেয়ে অনেক বেশী ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত, মহীয়ান। অনুরূপভাবে বিপ্লবের প্রতি বিরোধিতাও কেবল দু-একটি অংশে সীমিত নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষ বিপ্লবের পক্ষে এবং তারা বিপ্লব সম্পাদন করেছে। এরই পাশাপাশি, সমাজের বহু স্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠ কিছু লোক রয়েছে, যাদের স্বার্থ বিপ্লবের দ্বারা বিপন্ন হয়েছে। তাই এরা বিপ্লবের বিরোধিতা করে। এমনকি কিছু ধর্মীয় নেতাও বিপ্লবের বিরোধিতা করে। কারণ এরা শাহের সরকার ও পুঁজিপতিদের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং বিপ্লবের বিজয়ের ফলে এদের স্বার্থাবলী ও সুবিধাসমূহ নষ্ট হয়েছে। বাজারীদের মধ্যেও কিছু আছে, যারা শাহের সময়ে সহজেই মানুষকে প্রতারিত করে অর্থ উপার্জন করতে পারত, কিন্তু এখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র তাদের এ কাজে বাধা দিচ্ছে। তাই এরা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। সরকারী কর্মচারী ও পণ্ডিতদের মধ্যেও কিছু আছে, যারা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। কারণ বর্তমান সরকার তাদেরকে বেআইনী লেনদেন, উৎকোচ, তহবিল তছরূপ ও ব্যভিচারে বাধা দেয়। অন্যরা রাজনৈতিক বা আদর্শগতভাবে পূর্ব বা পশ্চিমমুখী বলে এ বিপ্লবের বিরোধী। গুটিকয় ব্যক্তিকে খুশী করার জন্যে ইসলামী বিপ্লব 'পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়' নীতি বর্জন করতে পারে না। যদি তা

www.pathagar.com

করে, তাহলে এ বিপ্লব আর ইসলামী থাকবে না। এমনকি তা বিপ্লবও হবে না, হবে সংস্কার মাত্র।

স্বচ্ছল অংশের এ বিরোধিতা সত্ত্বেও লাখো লাখো মানুষ ইসলামী বিপ্লব সমর্থন করে, এর সমর্থনে জীবন কোরবানী করতে চায়, আবেদন জানায় এ বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র বজায় রাখার জন্যে। বুদ্ধিজীবীরা নয়, সমাজের এ অংশই ইসলামী বিপ্লবকে বিজয়ী করেছে। বিপ্লবের নেতৃত্ব ও বিপ্লবী শক্তিসমূহ এই টেকনোক্র্যাটদের সঠিক পথে আনতে এবং দেশ পুনর্গঠনে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। এ পর্যন্ত এ ধরনের বহু লোককে বিপ্লবী স্রোতধারায় আত্মস্থ করা হয়েছে। তারা এখন দেশ পুনর্গঠনে অংশ নিচ্ছে। তবে এমন কিছু লোক আছে, যারা বিপ্লব ও তার লক্ষ্য গ্রহণের জন্যে পূর্ব বা পশ্চিমী প্রবণতা থেকে দূরে আসতে পারবে না। এ লোকগুলোকে বিপ্লবের সাথে সমঝোতা করতে হবে। এদের সাথে বিপ্লব সমঝোতায় আসবে না। সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিপ্লবে শরীক হয়েছিল; তাই ইরানের ইসলামী বিপ্লব সমাজের দু-একটি অংশের মালিকানাধীন নয়। বর্তমানে ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকরা গোটা দেশে উৎসাহভরে দেশের সেবা করছে, পুনর্গঠন করছে দেশ। মজার ব্যাপার যে, বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ও ছাত্র ইসলামী বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করছে, রণাঙ্গনে স্বেচ্ছায় কাজ করছে। এদের অনেকেই ইসলামী বিপ্লবের সুরক্ষায় মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছে।

বিপ্লবের নেতৃত্ব

গণ-শক্তি ব্যতীত নেতৃত্ব যেমন বিপ্লব করতে পারে না, অনুরূপভাবে নেতৃত্ব ব্যতিরেকে জনগণও বিপ্লব সংঘটনে অক্ষম। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয় (নেতৃত্ব ও জনগণ) মুদ্রার দু'পিঠ, বিপ্লবের নেতা হিসেবে ইমাম খোমেনী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জনগণও সত্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠায় ইমাম খোমেনীর সংকল্পবদ্ধতা প্রদর্শন করে। ইরানের জনগণ ইমাম খোমেনীকে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতীক এবং আল্লাহর শুদ্ধতা, রহমত, বিচার ও কল্যাণের মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করে। ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তারা এমন একজনকে খুঁজে পায়, যিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে লড়াই করেন না, যিনি আল্লাহর বান্দাদের জন্য ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কাজ করেন না। তারা আন্তরিকভাবে ইমাম খোমেনীর প্রশংসা করেন। কারণ তিনিই তাদেরকে উপনিবেশবাদী ও আন্তর্জাতিক নিপীড়কদের থাবা থেকে মুক্ত করেছেন, তিনিই বিশ্বের বর্তমান মানুষদের মানবের ঐশী চরিত্রে উন্নীত করেছেন। আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও বিশ্বের

www.pathagar.com

নিপীড়িত-বঞ্চিতদের রক্ষার দায়িত্বে নিজেকে সমর্পণ করে ইমাম খোমেনী জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন।

জনগণের উপর ইমাম খোমেনীর এ প্রভাবের কারণেই বিপ্লবী নেতৃত্বকে বিভক্ত করার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। অস্ত্র বা পূর্ব অথবা পশ্চিমের ওপর নির্ভর না করে, বৃহৎ শক্তিবর্গের মোকাবিলা করে এবং তাদের আধিপত্য অস্বীকার করে এরকম একটি মহান বিপ্লব সম্পাদন তাঁর প্রভাবের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

ইমাম খোমেনী কেবল একজন অপরাজেয়, অক্লান্ত যোদ্ধাই নন, তিনি একজন ফকিহ, একজন নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, কোরান সম্পর্কে বিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রের শিক্ষক, একজন নৃতত্ত্ববিদ এবং একজন মহান রাজনীতিবিদ। তেহরান থেকে ৩ শ' ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে খোমেন শহরে ১৩২০ চান্দ্র হিজরীর ২০শে জামাদিউস সানি (১৯০২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১২৭৯ সৌর হিজরীর ২রা মেহর) জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে ব্যক্তি, তাঁরই মধ্যে এসব গুণের সমাহার ঘটে। এক ধর্মপ্রাণ পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবে তিনি রেজা পাহলভীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে পিতার শাহাদৎ বরণ দেখেন। এসব গুণই তাঁকে করেছে একজন মুজাহিদ। বিশ্বের সকল জাতি তাকে আন্তর্জাতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে গণ্য করে। তিনি কোমের ধর্ম বিদ্যালয়ে ইসলাম ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। উপনিবেশবাদীদের নির্দেশে রেজা শাহ যে বছর ইসলাম উচ্ছেদ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি সে বছরই পাহলভী রাজবংশের বিরুদ্ধে শুরু করেন সংগ্রাম। ১৩৪২-এ (১৯৬৩ তে) যখন তিনি একজন মহান 'মরজি' (যার কাছে আপীল করা হয়) হিসেবে পরিচিত, সে বছরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। শাহ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমালোচনার জন্যে এটা করা হয়। তবে ৮ মাস পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৩৪৩-এর আবানে (১৯৬৪-র অক্টোবর/নবেম্বরে) শাহ ও যুক্তরাষ্ট্রের আরো কঠোর সমালোচনার জন্যে তাঁকে আবার গ্রেফতার এবং তুরস্কে ও পরে ইরাকের নাজাফে নির্বাসন দেয়া হয়। ১৪ বছর নির্বাসন এবং শাহ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামের পরে ১৩৫৭-এর ১৩ই মেহরে (১৯৭৮-এর ৫ই অক্টোবর) ইরাকের বাথপন্থী সরকার ইমাম খোমেনীকে বহিষ্কার করে। তিনি প্যারিস যান। সেখানে তিনি ১৩৫৭-এর ১২ই বাহমান (১৯৭৯-এর ১লা ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এরপর তিনি লাখো লাখো ইরানীর সোৎসাহ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে ইরান প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বছরেরই ২২শে বাহমান (১৯৭৯-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী) ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ে নেতৃত্ব দেন।

www.pathagar.com

১৩৪২-এর ১৫ই খোরদাদ (১৯৬৩'র ৫ই জুন) থেকে শুরু করে ১৩৫৭-এর ২২শে বাহমান (১৯৭৯-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ইরানের জনগণ বহুবার ইসলাম ও বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনীর প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করেছে। ১৫ই খোরদাদে জনগণ তাদের নেতার গ্রেফতারের খবর শোনা মাত্র রাস্তায় নেমে আসে এবং শাহর ভাড়াটে সৈন্যদের বুলেটের সামনে পড়ে। শাহাদৎ বরণ করে ১৫ হাজার মানুষ।

১৩৪২-র ১৫ই খোরদাদ থেকে ১৯শে বাহমান (১৯৭৯-র ৮ই ফেব্রুয়ারী) বিপ্লবের বিজয়ের সূচনা হওয়া পর্যন্ত জনগণ নেতৃত্বের প্রতিটি ডিক্রি মান্য করেছে, যদিও জনগণ থেকে নেতারা বহু দূরে ছিলেন। ১৯শে দে'তে (৯ই জানুয়ারী) ইত্তেলাতে (সে সময়ের অন্যান্য পত্রিকার মত এটাও সাভাকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল) ইমাম খোমেনীর প্রতি অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশের পরে প্রতিবাদ জানিয়ে কোম ধর্মীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও কোমের জনগণ বিক্ষোভ মিছিল বের করে ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ঐ ঘটনার ৭ম ও ৪০তম দিবসে দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণ ঐদিন জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে মিছিল করে। তাব্রিজে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং কয়েকজন শহীদ হয়। প্রতিটি ঘটনার পরে ৭ম ও ৪০তম দিবসে শহীদদের স্মরণে মিছিল হয়। খোমেনী জিন্দাবাদ, শাহ মুর্দাবাদ, শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভকারী মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এসব ঘটনায় ইমাম খোমেনীর জন্যে জনগণের গভীর ভালবাসার প্রমাণ মেলে। এ ঘটনাসমূহ ১৩৫৭-এর ১৭ই শাহরিবার (১৯৭৮-এর ৮ই সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একমাত্র যে ঘটনা জনগণকে রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে শামিল করে ও বুলেট বর্ষণ মোকাবিলা করায়, তা হচ্ছে ইমাম খোমেনীর বক্তৃতা ও বিবৃতি। এগুলো প্রথমে নাজাফ থেকে, পরে প্যারিস থেকে টেপে ধারণ করে ইরানে আনা হত। বিপ্লবী মুসলমানরা ইমামের ভাষণসমূহের অনুলিপি তৈরীতে সময় নষ্ট করতেন না এবং জনগণকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে জনগণের মধ্যে বিলি করতেন। জঙ্গী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এসব ভাষণ ও ঘোষণা মসজিদসমূহে ব্যাখ্যা করতেন এবং জনগণ তাদের ইমামের নির্দেশ পালন করত।

১৩৫৭'র ১৭ই শাহরিবারে চার সহস্রাধিক মুসলমানকে শাহের চররা তেহরানে হত্যা করে। জনগণ শাহ সরকারেরই প্রতিদিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে জালেহ স্কোয়ারে সমবেত হয়েছিল। ২২শে বাহমান (১১ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত এ ধরনের রক্তাক্ত ঘটনাবলী ঘটে। জনগণ নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করতে থাকে, যতই দিন অতিক্রম হয় ততই তারা সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে ওঠে, ইমাম খোমেনীর জন্যে তাদের প্রেম বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনী ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ও আন্তরিক সম্পর্ক হচ্ছে আশ্চর্যজনক ঘটনা। বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবর্গ কয়েকবার একথা উল্লেখ করেছেন। ইমামের নির্বাসনকালে তারা জনগণের কাছে ইমামের বাণী পেঁৗছে দেয়ার জন্যে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব পরিচালনার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এই ধর্মীয় নেতৃবর্গ দেখেছেন যে, ইমামের নির্দেশ অনুসারে জনগণ কিভাবে কাজ করেছে। বিপ্লবের বিজয়ের পরেও এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে, ইমাম তাঁর ভাষণসমূহে জনগণের প্রতি আন্তরিক ইচ্ছা প্রদর্শনে কার্পণ্য করেননি। ইমাম যখন বছরের পর বছর যাবৎ জনগণ থেকে দূরে ছিলেন, তখনও এই বন্ধন টিকে ছিল। এটাই ইরানী জনগণের ও বিশ্বের নিপীড়িতদের মধ্যে ইমামের গভীর প্রভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে। ইমাম খোমেনী কখনোই সমাজ থেকে দূরে বাস করেননি এবং সবসময়ই জনগণের যন্ত্রণা, দুর্দশা ও সমস্যাবলী, বিমূর্ত ও মূর্ত সম্পর্কে অবহিত থেকেছেন। এটাই হচ্ছে সত্য। জনগণ ও সরকারের মধ্যে আধ্যাত্মিক ফারাকের কারণে সরকার সম্পর্কে জনগণ নির্লিপ্ত থাকে। সচরাচর রাজনীতিবিদরা জনগণ ও জনগণের সমস্যা থেকে দূরে থাকে; নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন মেটাতে রাজনীতিবিদরা ব্যবহার করে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান। তারা জনগণ সম্পর্কে অবহিত নয়; জনগণও তাদেরকে আপন মনে করে না। জাতির যাত্রা-পথ থেকে সরকারের পথ পৃথক থাকে। আমি যদি বলি যে, ইসলামী বিপ্লব ও জাতির যাত্রা-পথ একটিই, তাহলে তার কারণ হচ্ছে, জনতার নেতা জনতার কাতার থেকেই আসেন এবং জনতার সাথে ক্লেশ ও দুর্দশা ভোগ করেন; তিনি জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং সরকার ও শাসন কাজের দায়িত্বকে জনগণের সেবা করার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে মনে করেন।

বিপ্লবোত্তর ইরানে কিছু রাজনীতিবিদ ছিল, যাদের যাত্রা-পথ আল্লাহ বা জাতির যাত্রা-পথ থেকে পৃথক, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই জনগণ ঐসব রাজনীতিবিদকে প্রত্যাখ্যান করে। ঘৃণিত-অভিসপ্ত শাহের ক্ষেত্রেও ছিল একই সমস্যা। প্রবঞ্চনা ও স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে যে বছরের পর বছর শাসন চালিয়েছে, সে জনতার বিক্ষোভ আর প্রতিহত করতে সক্ষম হয় না এবং ১৩৫৭'র ২৬শে দে'তে (১৯৭৯'র ১৬ই জানুয়ারী) কাঁদতে-কাঁদতে দেশত্যাগ করে। বিপ্লব চূড়ান্ত রূপ নেবার পূর্ববর্তী দু'বছরে শাহ চারবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন করে, অবশেষে নিয়োগ করে বখতিয়ারকে। বখতিয়ারের বাহ্য ভাবমূর্তি ছিল দেশপ্রেমিকের কিন্তু সে ছিল আমেরিকার পুতুল এবং সময়মতো প্রভুর কাজে লাগার জন্যে পাশেই অপেক্ষা করছিল। শাহকে সামরিক আইন এবং ধূর্ততারও আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু সে কোনভাবেই জনগণকে প্রতারিত করতে পারেনি। ১৭ই শাহরিবারের রক্তাক্ত

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞের পরে সে জনগণের সামনে অনুতাপ প্রকাশে এবং ভবিষ্যতে এমন অপরর করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে যতই জনগণকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে, জনগণ তাকে ততই প্রত্যাখ্যান করেছে। সে সমগ্র জীবনব্যাপী বিলাসপূর্ণ প্রাসাদসমূহে পান ও ইন্দ্রিয়সুখকর কাজে লিপ্ত থেকে, চারপাশে ঘিরে থাকা চতুর সমর্থক ও মোসাহেবদের দিয়ে লুণ্ঠন করেছে জনতার সম্পদ, ধ্বংস করেছে দেশ।

২৬শে দে'তে জনগণ শাহের দেশ থেকে পলায়নের খবর শোনা মাত্র রাস্তায় নেমে আসে এবং তামাম ইমাম জুড়ে দিবসটি পালন করে। ইমামের তেহরান আগমন উপলক্ষে এই জনগণই সারা দেশ থেকে এসে সমবেত হয় তেহরানে। মেহরাবাদ বিমান বন্দর থেকে বেহেশ-ই জাহরা (শহীদদের সমাধিস্থল) পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ কিলোমিটার পথ সেদিন মানুষে-মানুষে সয়লাব হয়ে যায়। ইমামের বাসগৃহে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে ১৩৫৭'র ২১শে বাহমানে (১৯৭৯'র ১০ই ফেব্রুয়ারী) বখতিয়ার ২৪ ঘন্টার সান্ধ্য আইন জারি করলে এ জনতাই ইমামের বাড়ী চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে, ইমামকে রক্ষায় রচনা করে জনতার ব্যূহ। এই চমকপ্রদ প্রতিরোধই বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় ঘটায়। ঐশ্বরিক নেতাদের জন্যে ছাড়া এমন ত্যাগ ও প্রেমের উদাহরণ ইতিহাসে মেলে না। এই নেতা ও জাতির মধ্যেকার প্রেমের মত কিছু বর্ণনা করতে সক্ষম হয়নি কোন কবি। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব মেনে ইরানের জনগণ যে বীরগাঁথা রচনা করেছে, কোন চিত্রকর তার অনুরূপ কোন ছবি আঁকতে সমর্থ হয়নি। ইসলামের প্রাণসঞ্চারী শিক্ষার অধীনে মানুষকে মানবীয় প্রকৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ; পৌত্তলিকতা,নাস্তিক্যবাদ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানবতার প্রতি প্রেম, আল্লাহর বিশ্বাসই এমন ঘটনা ঘটাতে পারে, সৃষ্টির সবল করদ্বয়ই পারে এমন ঘটনা উপস্থাপন করতে। এবং এটাই হচ্ছে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব ও ইসলামী বিপ্লবের চরিত্র। নিপীড়ন, অন্যায়, উপনিবেশীকরণ ও আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে জাতিসমূহের কাছে এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই।

প্রতিশ্রুত মুহূর্ত

ইমাম খোমেনী রাজতন্ত্র উৎখাতের জন্যে সতেরো বছর ধরে অঙ্গীকার করেছেন। এ সময়ে শাহও এমন ঘটনা রোধে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। জনতার চিন্তা কণ্ঠস্বর হয়ে প্রকাশের পূর্বেই শাহর নিরাপত্তা সংস্থাগুলো জনতার কণ্ঠরোধ করেছে, শাহর প্রচার মাধ্যমগুলো এসব অপরাধী কাজকে সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিরাময় হিসেবে দেখাত। এসময়ে ইমাম খোমেনীর বই, ছবি, চিঠি,

www.pathagar.com

এমনকি তাঁর নামোচ্চারণও অবৈধ বলে পরিগণিত হত এবং এ 'অপরাধের' ন্যূনতম শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ফাঁসি। তুরস্ক ও ইরাকে ১৪ বছর নির্বাসনকালে জঙ্গী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবী মুসলমানের মাধ্যমে জনগণের সাথে তার গোপন যোগাযোগ ছিল। এ সময়ে ইমাম জনগণকে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন বিজয়ের আশা। বিপ্লবী শক্তিসমূহ বিপ্লবী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিত, জনগণের কাছে উন্মোচিত করত পাহলভী শাসনের প্রকৃত অবয়ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক বিপ্লবী শহীদ হয়েছেন; কারান্তরালে, নির্বাসনে বা অত্যাচারের মধ্যে কাটিয়েছেন অনেক বছর। ১৩৫৬'র ১লা আবানে (১৯৭৭'র ২৩শে অক্টোবর) ইমাম খোমেনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোস্তাফা খোমেনী ইরাকের নাজাফে রহস্যজনকভাবে খুন হন। প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা সৈয়দ মোস্তাফা খোমেনীকে ইরাকে বলপূর্বক নির্বাসনে পাঠানো হয়। ইরানীরা, বিশেষতঃ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেন পরিস্থিতি উপযুক্ত। সে সময়ে কার্টারের উদারনীতি অনুসৃত হচ্ছিল। জনতার বিক্ষোভ প্রশমিত করতে শাহ সরকার প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ দেয়। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইমাম-পুত্রের স্মরণ-সমাবেশগুলোকে শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনৈতিক সমাবেশ রূপ দেন এবং জনগণকে প্রকৃত অবস্থা জানান। এর ফলে ঐ বছরেরই ১৯শে দে'তে (৯ই জানুয়ারী, ১৯৭৮) কোমের তোলাবা ও জনগণ এত্তেলাত পত্রিকায় সাভাক প্রকাশিত ইমাম খোমেনী সম্পর্কে অবমাননাকর প্রবন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন। এদের কয়েকজন শাহর পুলিশ ও রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে শহীদ হন। এ ঘটনার পরে ঘটে ১৭ই শাহরিবারের হত্যাযজ্ঞ। চার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু শহীদ হয়। এ অপরাধে শাহ ভীত হয়ে পড়ে এবং তেহরানসহ ১৪টি প্রধান শহর-নগরে সামরিক আইন জারি করা হয়। ইস্পাহানে এরও আগে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়। ১৭ই শাহরিবারের কয়েকদিন আগে ক্ষমতাসীন হওয়া জাফর শরীফ ইমামী মন্ত্রিসভা সকল ছল-চাতুরী সত্ত্বেও কোন কিছু করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে, ১৩৫৭'র আবানে (১৯৭৮'র অক্টোবর/নভেম্বর) ইমামীর মন্ত্রিসভায় স্থান নেয় আজহারির সামরিক মন্ত্রী পরিষদ। শেষোক্ত মন্ত্রিসভা মোহররমের প্রথম দিনেই তেহরানে শত-শত নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। এরা ইমাম হোসেনের শাহাদৎ বরণ উপলক্ষে শোক প্রকাশ করছিল। অন্যান্য নগরেও প্রতি দিনই এ ধরনের অপরাধ ঘটতে থাকে। শাহ সরকারের অপরাধীদের হামলা থেকে প্রেক্ষাগৃহের মত জনসমাগমের ও মসজিদের মত পবিত্র স্থানগুলোও নিরাপদ ছিল না। ১৩৫৭'র মোরদাদে (১৯৭৮'র জুলাই/আগস্টে), আমুজেগারের মন্ত্রিসভার শেষদিকে, সাভাক চররা আবাদানে একটিপ্রেক্ষাগৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়, সিনেমা দেখছিল, এমন শত-শত নারী-পুরুষ-শিশু জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ

www.pathagar.com

হয়। এ অপরাধের দায়িত্ব বিপ্লবীদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের সুনাম অর্জন করাই ছিল সাভাক চরদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইরানের জনগণ অল্প সময়ের মধ্যে এ চক্রান্ত প্রকাশ করতে সক্ষম হন এবং সত্য প্রকাশের মাধ্যমে শাহ ও তার চরদের মুখোশ উন্মোচন করেন।

শরীফ ইমামী সরকারের শেষদিকে সাভাক চররা কারমানের একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা ছাড়াও শাহের ভাড়াটে সেনারা কোরান পোড়ায়। মসজিদে বহু পুরুষ ও নারী শাহ-সেনাদের হাতে শহীদ ও আহত হয়। কয়েকজন মুসলমান নারীর ইজ্জতও লুটে নেয় শাহের সৈন্যরা। বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী সরকারগুলোর সংঘটিত শাহের অসংখ্য অপরাধের প্রেক্ষিতে ১৩৯৯'র ৯ ও ১০ই মোহররম (১৯৭৮'র ১১ ও ১২ই ডিসেম্বর) তাসুয়া ও আশুরার মিছিলে তেহরান ও অন্যান্য নগরের জনগণ শাহকে উৎখাতের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আহবান জানায়। বিপ্লবী নেতাদের ভাষণ শোনার জন্যে আজাদী স্কোয়ারে যে ১০ লাখ লোক সমবেত হয়, তাদের ওপর গুলীবর্ষণের জন্যে শাহ সর্বোত্তম কম্যাণ্ডোদের তৈরী রাখে। শাহ অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার, কামান ও মেশিনগান তৈরী রাখে। সমবেত সকলকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়াই ছিল শাহর উদ্দেশ্য। কিন্তু লাভিজান গ্যারিসনে শাহর রক্ষীরা যখন একাজের জন্যে তৈরী হচ্ছিল, সে সময় বিপ্লবের প্রবক্তা ধার্মিক নন্-কমিশন্ড অফিসারদের মধ্য থেকে দু'জন ঐ স্থানে আক্রমণ চালান এবং অনেককে হতাহত করেন। এভাবেই শাহর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, মিছিলকারীরা সমবেত হয়ে শাহকে অপসারণের আহবান জানান।

আশুরার দিনে লাভিজান চক্রান্ত পরাস্ত হওয়া এবং আশুরা ও তাসুয়া দিবসে জনগণের মিছিল অনুষ্ঠান সাফল্যের পরে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা শাহের ওপর থেকে সকল আশা হারিয়ে ফেলে এবং একটি নতুন চাল মারার সিদ্ধান্ত নেয়। এ নতুন চালটি তারা অনেক আগে থেকেই জাতীয় ফ্রন্টের মধ্যে গুছিয়ে রেখেছিল। এ চালটি হচ্ছে: শাপুর বখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে। বখতিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণের পরে শাহ মিসরের ফারাও আনোয়ার সাদাতের সাথে যোগ দিতে কায়রোর উদ্দ্যেশে রওনা হয়। ১৩৫৭'র ২৬-এ দে'তে (১৯৭৯'র ১৬ই জানুয়ারী) এ ঘটনা ঘটে। ইমাম খোমেনীর পথের অনুসারী হিসেবে ভান করে বখতিয়ার প্রথমে জনগণকে প্রতারণা করার চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণ বোকা বনেনি এবং তারা বখতিয়ারের ক্ষমতাচ্যুতির আহবান জানায়। এক মাস ক্ষমতায় থাকার সময় বখতিয়ার ইনকিলাব স্কোয়ারে ও তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যাসহ বহু অপরাধী কাজ করে। এছাড়াও বখতিয়ার ইমাম খোমেনীকে ইরানে প্রত্যাবর্তন করতে দিতে অস্বীকার করে। ইমাম খোমেনী ১৩৫৭'র ৬ই বাহমানে (১৯৭৯'র ২৬শে জানুয়ারী) প্যারিস থেকে ইরান প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

বখতিয়ার মেহরাবাদ বিমানবন্দর সকল বিদেশী বিমানের ফ্লাইটের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে। এভাবে ইমামের প্রত্যাবর্তন ১৩ই বাহমান (১লা ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। ইমামকে স্বাগত জানানোর জন্যে সারা দেশ থেকে তেহরানে সমবেত জনগণ তেহরানেই অবস্থান করতে থাকে এবং জনগণ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে বখতিয়ার ইমামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে সকল বাধা অপসারণে বাধ্য হয়। তেহরানে ঐতিহাসিক আগমনের পরে ইমাম বেহেশ-ই জহরায় যান। এখানে তিনি এক অতি তাৎপর্যময় ভাষণ দেন। তিনি বখতিয়ারের মন্ত্রিসভা বেআইনী ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, তিনি নিজেই সরকার গঠন করবেন।

ইরানে ইমামের প্রত্যাবর্তনের পরে বখতিয়ার মাত্র ১০ দিন নিজের শাসন টিকিয়ে রাখে। এ সময়ে এমনকি সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী তার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। বিমান বাহিনীই প্রথমে ইমাম খোমেনীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। ইমাম ও অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা তেহরানের যে অংশে বাস করতেন, বখতিয়ার সেখানে বিমান ও স্থল বাহিনীর সাহায্যে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে। বিপ্লবী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এভাবে শেষ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ২১শে বাহমান (১০ই ফেব্রুয়ারী) এ চক্রান্ত রূপায়ণে সে যখন রাত-দিন সান্ধ্য আইন জারি করে জনগণের রাস্তায় আসা রুখতে চেষ্টা করে, তখন সে ইমাম খোমেনীর নির্দেশে জনগণের সমাবেশের মুখোমুখী হয়।

১৩৫৭'র ২২শে বাহমানে (১১ই ফেব্রুয়ারী) তেহরানে রাস্তায় রাস্তায় ২৪ ঘন্টা যুদ্ধের পরে সেনাবাহিনীর তিনটি বাহিনী তেহরান ও সারা দেশে বিপ্লবী বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়। একনায়কত্ব ও উপনিবেশবাদীদের জন্যে মধ্যস্থতা ছাড়া অন্য কিছু দেয়নি যে রাজতন্ত্র উৎখাত হয়।

সুদীর্ঘ পথ

কোন প্রকৃত বিপ্লব যখন সফল হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব তার ঈপ্সিত পথের সূচনাস্থলে পৌঁছে মাত্র। তাই বিপ্লবের বিজয়ের অর্থ হচ্ছে, বিপ্লবের লক্ষ্যের পথে বাধা অপসারণ। তবে বিপ্লব সম্পর্কে কিছু লোকের এ ধারণা নেই। তারা কল্পনা করেছিল, বিপ্লবের পথে সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাল্টে যাবে এবং বিপ্লব নির্দ্ধারিত পথে এগিয়ে চলবে। এ ভ্রান্ত ধারণা বিনির্মাণের উদ্যোগে বিপ্লবের গতিশীলতার পথে বাধা তৈরী করতে পারে। বিপ্লব সম্পর্কে যারা এরকম ধারণা পোষণ করে, তাদের আশা থাকে সীমাহীন। অথচ এ আশা বাস্তবতা ও বিপ্লবের ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া বিপ্লব যাতে বিনির্মাণের পথে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্যে যে শক্তির বিপ্লবের সেবা করা উচিত, তারা

www.pathagar.com

অনেকে বিপ্লবের কাছ থেকে পুরস্কার দাবী করে। এ ভুল ধারণার কারণেও নব-উদ্ভূত বিপ্লব বহু সমস্যার অতিরিক্ত হিসেবে আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এধারণা স্পষ্ট করার জন্যে চেষ্টা চালানো উচিত।

পূর্ব ও পশ্চিমের সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র অংশটি, সাভাক সদস্যদের অবশিষ্টাংশ এবং বিপ্লবের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা এ পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। ইসলামকে মোকাবেলা করতে ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিতে এ বিচ্যুৎ অংশগুলো কল-কারখানায় যায় এবং কল্যাণমূলক দাবীদাওয়া ও বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্যে শ্রমিকদের উৎসাহ দেয়। অথচ শ্রমিকরা কয়েক মাস ধর্ম-ঘটের পরে সবেমাত্র উৎপাদন শুরু করেছে। এ ঘটনা ঘটে বিজয়ের প্রদোষকালে এবং দেশ যখন পাহলভী রাজবংশের কুকীর্তির ফলে ধ্বংস হয়ে কেবল বিনির্মাণের পথে এগোচ্ছে। শ্রমিকদের বিপথে চালিত করতে এসব গোষ্ঠীর চেষ্টা তাদের ও তাদের প্রভু বৃহৎ শক্তিদের অনভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। উদাহরণত ঃ বাহ্যত মার্কসবাদী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার অনুসারী একটি উপদলের নেতা এক জনসমাবেশে দাবী করে যে, দেশের অর্থনীতির দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে দিলে, তারা রাতারাতি অর্থনৈতিক সমস্যাবলী দূর করবে।

বিপ্লব বিজয়ী হলেই যে বিপ্লবের কাজ শেষ হয় না, এ কথা জনগণকে বোঝানো সহজসাধ্য ছিল না। বিপ্লবীরা বিনির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিল। তাই তারা প্রতিবিপ্লবী দলছুট উপদলগুলোর প্রচারণার মত পাল্টা প্রচারণা চালাতে পারছিল না। তবে বিপ্লবের নেতৃপদে আসীন ব্যক্তিবর্গ এসব দলছুট উপদলের এবং জাতীয়তাবাদ ও উদারতাবাদের কাজ-কর্মের প্রকৃতি সাফল্যের সাথে তুলে ধরেন। তারা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করেন যে, বিপ্লবের সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথ এবং বিপ্লবের কাছে নিজেদেরকে ঋণী মনে করতে ও বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যে নিজেদের আত্মত্যাগ করতে হবে। জনগণের উচিত হবে না বিপ্লবকে নিজেদের কাছে ঋণী মনে করা এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুরোপুরি নির্ভরশীল দেশের থেকে নিজেদের জন্যে সুবিধা নেয়া। এ দেশের পুনর্গঠনের জন্যে প্রয়োজন বিপুল শক্তি ও দীর্ঘ সময়।

বিপ্লবের নেতার ওপরে লাখো-লাখো জনতার পুরোপুরি আস্থা না থাকলে চিলির বিপ্লবের মত ইরানের ইসলামী বিপ্লবও পূর্ব ও পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত উপদলগুলোর সূক্ষ্ম পাকে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। তবে ইরানী জনগণের ইসলাম প্রেম ও ইসলামী সরকার কায়েমে তাদের সংকল্পবদ্ধতা প্রকৃত পথ থেকে ইসলামী বিপ্লবকে বিচ্যুৎ করার বিভিন্ন চক্রান্ত প্রতিহত করেছে। এভাবেই, আরেকবার ইরানকে উপনিবেশবাদীদের অংকে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। ইসলামী বিপ্লবের ব্যতিক্রমী চরিত্র হচ্ছে, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক

www.pathagar.com

শত্রুরা ছাড়াও অনবহিত মিত্ররাও এ বিপ্লবকে দারুণ আঘাত করেছে ; কিন্তু ইসলামী বিপ্লব আগের মতই নিজস্ব পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলে। ইসলামী বিপ্লবের অকৃত্রিম ইসলামী প্রকৃতিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের (মুক্তি আন্দোলন বা অস্থায়ী সরকার) হাতে দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ইরানের ইসলামী বিপ্লব নিজস্ব অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে ও সত্য পথে এগিয়ে চলতে সক্ষম হয়। এটাই হচ্ছে বিপ্লবসমূহের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিক। অথচ ঐ ব্যক্তিরা ইসলামী বিপ্লবকে বিচ্যুৎ করতে বহু চেষ্টা চালিয়েছিল। বিশেষজ্ঞ পরিষদ যখন সংবিধান প্রণয়ন করছে, সে সময় অস্থায়ী সরকার ১৭ জন মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এক ইশতেহারের মাধ্যমে ঐ পরিষদ বিলোপের ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ পশ্চিমা ধাঁচে সংশোধিত ইসলামের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকার প্রণীত সংবিধানের খসড়া প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশুদ্ধ ইসলাম ও বিলাইত-ই ফকিহ্'র (ফকিহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা—৮৭ পৃষ্ঠায় দেখুন) ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নে সিদ্ধান্ত নেয়। এ কারণেই অস্থায়ী সরকার অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিপ্লবের প্রকৃত মালিক জনগণের সাথে বা বিপ্লবের নেতা ইমামের সাথে বিশেষজ্ঞ পরিষদের আলোচনার আগেই পরিষদ বিলোপ করার জন্যে অস্থায়ী সরকারের মতলব ছিল। বিপ্লবের পরবর্তী ৯ মাস বিপ্লব রক্ষা করেছে যে মুক্তি ফ্রন্ট ও বিপ্লবী সরকার, তাদের সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলে বিপ্লবের প্রথম দিকে নেপথ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর দু'টি উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সে দু'টি ঘটনা হলো ঃ

রাজতান্ত্রিক শাসনের শেষ দিনগুলোতে ইমাম খোমেনীর ডিক্রিবলে মিঃ বাজারগান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সে বিপ্লবী পরিষদে উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আলী আসগর হাজ সৈয়দ জাভেদীর নাম প্রস্তাব করে। শাহর শাসনাধীনে কোন দমন-পীড়ন নেই এবং সকলে অবাধে সমালোচনা করতে পারে বলে জনগণকে দেখানোর জন্যে আলী আসগর হাজ সৈয়দ জাভেদীকে শাহ নিরাপদ নির্গমন পথ হিসেবে ব্যবহার করত। শাহকে দোষমুক্ত করার জন্যে শাহের অপরাধ ও দেশদ্রোহিতামূলক কাজের জন্যে রাষ্ট্রের অন্য নেতাদের দায়ী করে জাভেদী চিঠি লিখত এবং সে চিঠিগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হত। ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্যে সাভাক চররা তার বাসার কাছে ছোট-ছোট বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এসব ঘটনা সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। সরকার তার বিপক্ষে—এটা দেখানোর জন্যেই এ ব্যবস্থা করা হয়। জাভেদীকে ইরানের শাখারভ হিসেবে বিবেচনা করা হত। বিপ্লবের বিজয়ের পরে এই জাভেদীই মুজাহেদীন-ই খাল্‌ক সংগঠন, জঙ্গী মুসলিম আন্দোলন এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রুপের সাথে মিলে আয়ান্দেগান পত্রিকা বন্ধের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

www.pathagar.com

এ জন্যে খরচ যোগায় ইসরাইল। এ পত্রিকাটি ইহুদীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সেবা করত। জাভেদী ও তার সাথীরা আয়েন্দাগান পত্রিকা বন্ধের বিপ্লবী কাজটিকে "অগণতান্ত্রিক" বলে অভিহিত করে। জাভেদীর নিজের বক্তব্য অনুসারে একবার সাভাক-এর লোকেরা তার গৃহ তল্লাসী করে রেফ্রিজারেটরে রাখা কয়েক বোতল মদ ছাড়া কিছুই পায়নি। তাই ইসলামী বিপ্লবী সরকারে উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্যে বাজারগানের প্রস্তাব বিপ্লবী পরিষদের উলামাবৃন্দ, বিশেষতঃ আয়াতুল্লাহ শহীদ ডঃ বেহেশতী ও আয়াতুল্লাহ শহীদ মুতাহারির তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উলামাবৃন্দ যুক্তি দেখান ঃ যার ইসলাম এমনই যে, বাড়ীতে রেফ্রিজারেটরে মদ পাওয়া যায়, সে লোক কিভাবে ইসলামী সংস্কৃতি রূপায়ণের দায়িত্ব পেতে পারে? ৬০ হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে ইসলামী সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে, কিভাবে সে সরকারের সদস্য হিসেবে ঐ লোককে গ্রহণ করা যায়?

বিপ্লবের বিজয়ের প্রথমদিকে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে। বিপ্লবী পরিষদ ও সরকারের এক যৌথ অধিবেশনে বাজারগান এক খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। খবরটি হচ্ছে, একটি সমাবেশে একদল লোক "আমেরিকা মুর্দাবাদ" বলে শ্লোগান দিয়েছে। বাজারগান বলে, বর্তমানে যেহেতু আমেরিকানরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাই এরকম শ্লোগান দিয়ে তাদের বিরক্ত করা উচিত নয়। কারণ আমেরিকার সাথে সম্পর্ক রাখা ইরানের প্রয়োজন।

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োজিত ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে বাজারগান এ ধরনের চিন্তা প্রদর্শন করে। এটা মুক্তি আন্দোলনে তার মত একই আদর্শ অনুসারীদের চিন্তার মিল তুলে ধরে। এমন আরো উদাহরণ আছে। যেমন ঃ অস্থায়ী সরকারের মুখপাত্র আব্বাস আমীর ইন্তেজাম কর্তৃক আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি বিপ্লবের পথ থেকে অস্থায়ী সরকারের বিচ্যুতিরই প্রকাশ। এ ধরনের একটি সরকার ৯ মাস ক্ষমতায় থাকার ফলে বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু এ বিপ্লব সকল আঘাত প্রতিহত করেছে, এমনকি বৃহৎ শক্তিবর্গ ও এদেশে তাদের চরদের মহাষড়যন্ত্র সত্ত্বেও টিকে থেকেছে। ইরানের জনগণকে এখনো অনেক পথ যেতে হবে, এবং সে দীর্ঘ পথ চলার শক্তি ইরানী জনগণের রয়েছে। এটাই হল সত্য।

স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনসমূহ

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব একটি স্বাধীন বিপ্লব। এ বিপ্লব কেবল বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর নির্ভর না করার পথই অনুসরণ করেনি, সেই সাথে বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্রমাগত চক্রান্ত চলেছে এ বিপ্লবের বিরুদ্ধে। তাই দেশ

www.pathagar.com

বিনির্মাণে ও বিপ্লব সুরক্ষায় ইরানের জনগণ বাইরের সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে বিজয়ের পরমুহূর্ত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ শুরু করেন।

বিপ্লবের বিজয়-মুহূর্তে সকল সরকারী ভবন, সংগঠন, গ্যারিসন, সামরিক ও শৃংখলাকেন্দ্রের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলে দলিল-দস্তাবেজ, অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম প্রতিবিপ্লবী চোর ও মুনাফাখোরদের দ্বারা চুরি হওয়ার বিপদ দেখা দেয়। এ সময়েই জনগণ গোটা ইরানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিটি গঠন করে এবং সকল চলাচল তত্ত্বাবধান করে। এ কমিটিগুলোই শাহর চরদের গ্রেফতার ও বিপ্লবী আদালতে হস্তান্তর করে। এসব কমিটিই প্রতিবিপ্লবী ও মুনাফাখোরদের হাত থেকে সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করে। এ কমিটিগুলোই বিপ্লবের প্রথম মাসগুলোতে জনগণের দেখা-শোনা করে, তাদের ইজ্জত ও সম্পত্তির সুরক্ষা করে এবং যে কোন ধরনের প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা প্রতিহত করে। এ সত্ত্বেও প্রথম দিকে, যখন কোন কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, সেই অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির প্রথম দিনগুলোতে মুজাহেদীন-ই-খাল্‌ক সংগঠন ও ফেদাইন-ই-খাল্‌ক গেরিলা সংগঠনের মত উপদলগুলো ও মুনাফাখোররা বিপুল পরিমাণ অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি করে।

এক অতি মূল্যবান বিপ্লবোত্তর ঘটনা হিসেবে এসব স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন বিপ্লবী কমিটিতেই সীমিত ছিল না। তবে ইসলামী বিপ্লবী কমিটিগুলোই হচ্ছে জনগণের মধ্য হতে উদ্ভূত প্রথম সংগঠন, যেগুলোকে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিজয়ের অব্যবহিত পরে অনিশ্চিত দিনগুলোতে বিপ্লবের প্রকৃত অস্তিত্ব এসব স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এজন্যেই আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী ও তাদের বিদেশী প্রভুরা ইসলামী বিপ্লবী কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা তীব্র অপপ্রচার চালায়। এ কমিটিগুলোর আত্মত্যাগী রক্ষীরা তেহরানসহ ইরানের অন্যান্য নগরে রাতের অন্ধকারে প্রতিবিপ্লবীদের বুলেটের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বিপ্লবী রক্ষীরা জনগণের ইসলামী বিপ্লবের জন্যে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়। তবে এসব কমিটি সাহসিকতার সাথে সকল চক্রান্ত প্রতিহত করে এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে উপনিবেশবাদীদের এবং তাদের সচেতন ও অচেতন আভ্যন্তরীণ ভাড়াটে সেনাদের সকল ষড়যন্ত্র উৎপাটন করতে সক্ষম হয়।

ইসলামী বিপ্লবের পরবর্তী দু'বছরে বিভিন্ন শিল্প, সামরিক, কৃষি, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনও গড়ে ওঠে। এ বিপ্লবের মহত্তম সাফল্যগুলোর মধ্যে এসব আন্দোলনকে গণ্য করা উচিত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপনিবেশবাদী দেশসমূহ থেকে পণ্য আমদানী এবং শিল্প, কৃষি, সামরিক, চিকিৎসা, এমন কি শিল্প-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ইরানী

www.pathagar.com

সমাজকে ভোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপনে শাহ সরকার দেশের অভ্যন্তরে যে কোন প্রতিভা বিকাশে বাধা দিত। কেবল ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি ভোক্তা ব্যবস্থায় পরিণত করাই নয়, ইরানী জনগণকে বিশ্বাস করানো যে, তারা কোন ক্ষেত্রেই উদ্ভাবন বা আবিষ্কারে সক্ষম নয়, বরং অন্যদের পণ্য, এমনকি চিন্তাধারাও তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে—এটাই ছিল শাহের উদ্দেশ্য। এ কারণেই ইরানী জনগণের বিপুল প্রতিভা থাকলেও এবং বিখ্যাত উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, দার্শনিক ও গবেষকদের জন্যে ইতিহাসে ইরানীদের সুখ্যাতি থাকলেও পাহলভী শাসন আমলে ইরানী জনগণ উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের জন্যে কোন চেষ্টা করতো না। এমনকি কোন লোক এমন কাজ করলে, তাকে সাথে সাথে সাভাক খুঁজে বের করতো এবং তাকে মৃত্যু বা ঐ কাজ বর্জন, যে কোন একটি বেছে নিতে হত। মুহাম্মদ রেজা পাহলভীর শাসনের শেষ বছরগুলোতে এমন ভায়াবহ অপরাধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিপ্লবের বিজয়ের পরে এই অবদমিত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভরতার পানে এগিয়ে নেবে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার দিয়ে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ১৯৮১'র জুনে তেহরানে অনুষ্ঠিত এক শিল্প প্রদর্শনীতে আড়াই শতাধিক ইরানী শিল্প উদ্ভাবন প্রদর্শিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও প্রভূত বিকাশ সাধিত হয়। শাহর শাসন আমলে ইরানী কবি, চিত্রকর, নক্সাকার ও লেখকদের হয় সরকারের সাম্যবাদের সেবায় নিয়োজিত হতে নতুবা নৈরাজ্যবাদে আশ্রয় নিতে হত। তারা নিজেদের প্রতিভা কাজে লাগাতে পারতেন না। ইসলামী বিপ্লব এসব প্রতিভা বিকাশের পটভূমি তৈরী করে। এখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা কাজে লাগছে।

বিপ্লবী সংগঠনসমূহ

আমলাতন্ত্রের পরনির্ভরশীল মনোভাব এবং এদের অধিকাংশের দুর্নীতির কারণে বিপ্লব-পূর্ব ইরানে সমগ্র সামরিক, প্রশাসনিক ও আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা ছিল এমন ধরনের, যা বিপ্লবের কাজে আসতে পারে না। বিপ্লবোত্তর ইরানের সর্বাপেক্ষা মৌল ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল জনতার বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর উপযোগী সংগঠনের। ইসলামী বিপ্লবী কমিটি, ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী, ত্রাণ কমিটি, ইসলামী বিপ্লবী আদালত, সমাবেশ কমিটি, পুনর্গঠন সংগ্রাম, মুতাজাদিন (নিপীড়িত) ফাউন্ডেশন ও গৃহসংস্থান ফাউন্ডেশনের মত বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন এ কারণেই গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সরকারের অনুরূপ সংস্থাগুলো ধ্বংস করা এসব সংগঠনের উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবের চাহিদা পূরণ, সমগ্র সরকার ব্যবস্থায় অপর্যাপ্ততা ও অপ্রতুলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহ ও সরকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি এসব সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল মূল পরিকল্পনা। কিন্তু দেশের ভেতরে ও বাইরে এ বিপ্লবের শত্রুরা এসব সংস্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করে। শত্রু, বিপ্লবের অচেতন বন্ধু ও তাদের ধ্বংসাত্মক প্রচার কাজে হাত বাড়িয়ে দেয়া ব্যক্তিদের লক্ষ্য ছিল এসব সংস্থাকে সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী হিসেবে চিত্রিত করে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ মানুষ—সরকারী কর্মচারীদের এসব সংগঠনের প্রতি বৈরী করে তোলা। এটা হলে বিপ্লবী ও সরকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে ফারাক দেখা দিত, তাতে বিপ্লব ও দেশ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হত। এ চক্রান্তকালে তারা এসব সংগঠনের নামে মিথ্যা দোষ চাপায় এবং জনগনের কাছে এ সংগঠনগুলোর মর্যাদাহানির জন্যে তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করে।

সামগ্রিকভাবে, এ বিরূপ প্রচারণা এসব সংগঠনের ক্ষতি করে এবং কিছুটা পরিমাণে হলেও বিপ্লবের ক্ষেত্রে এসব সংগঠনের সেবাকে করে বিঘ্নিত। বিরাজিত আমলাতন্ত্রসহ বিপ্লব-পূর্ব সরকারী ব্যবস্থা রক্ষা ও বিপ্লবী সংগঠনসমূহের বিরোধিতা করার মতানুসারী অস্থায়ী সরকারের সৃষ্ট সকল বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও এ সংগঠনসমূহ উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে নিজেদের কাজ এগিয়ে নেয় এবং বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সম্পাদন করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এখন সবাই জানেন যে, বিপ্লবের বিকাশ এসব সংঠনের কাছে ঋণী। এসব সংগঠন ধ্বংসে শত্রুদের বারংবার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যে এ সংগঠনসমূহ কত ভালভাবে কাজ করত।

এসব সংগঠনের মূল নীতিমালা নীচে দেয়া হল। অন্যান্য দেশে ভবিষ্যতে বিপ্লব সংগঠনে এ প্রসঙ্গ কাজে লাগবে।

১। ইসলামী বিপ্লবী কমিটি

বিপ্লব বিজয়ের পূর্বক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব ঘটনা ঘটে, ইসলামী বিপ্লবী কমিটি সেগুলোর অন্যতম। প্রথম দিন থেকে এ কমিটি গঠিত হয়। দেশের নিরাপত্তা বিধান, শাহ সরকারের চরদের গ্রেফতার এবং বিপ্লবের শত্রুদের দ্বারা সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠনরোধে এসব কমিটি গঠিত হয়। এমনকি বিপ্লবের বিজয়ের আগেও কিছু নগরে এ কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটি শাহের সরকারের চরদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

'অন্যসব বিপ্লবী সংগঠনের মত ইসলামী বিপ্লবী কমিটিসমূহের বিরুদ্ধেও ভিত্তিহীন সমালোচনা ও প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা চলে। এ সব কমিটির সাফল্য বিস্মিত ও কমিটি সদস্যদের নিষ্ক্রিয় করতে ক্ষতিকর লোকেরা এগুলোতে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ কমিটির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারণা চালিয়ে চক্রান্তকারীরা বিপ্লবের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে সব ধরনের কুকীর্তি চালায়।

যেহেতু এসব কমিটি পরিকল্পিতভাবে গঠিত হয়নি, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গঠিত হয়েছিল, সেহেতু এগুলোর কাঠামোতে দুর্বলতাও ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এসব দুর্বলতা দূর করা হয় এবং অযোগ্য লোকদের কমিটি থেকে বের করে দেয়ার পরে এসব কমিটি এখন বিপ্লব ও দেশের সেবায় অদ্বিতীয় ভাবে কাজ করছে। বর্তমানে এ কমিটিসমূহ বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী, সমাবেশ কমিটি ও পুলিশদের সাথে মিলে শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে এবং ইসলামী বিপ্লবের অনিষ্টকামী শক্তিদের পুরোপুরো উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করবে।

২। ইসলামী বিপ্লবী আদালত

মুহাম্মদ রেজা পাহলভীর শাসন আমলে বিচার ব্যবস্থা ছিল সরকারের হাতের যন্ত্র, যা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারত না, সরকার প্রধানদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করত এবং যেখানে বিচার বলে কিছু ছিল না। বিচার ব্যবস্থার অধিকাংশ কর্মীর উত্তম বিচারক হওয়ার কোন যোগ্যতা ছিল না, অথবা আইন সম্পর্কে ছিল একেবারেই অজ্ঞ! ইরানের বিচার ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলতে যাদের বোঝাত, তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতির হাতিয়ার ছিল, বড়-বড় বিদেশী কোম্পানীর জন্যে দালাল হিসেবে কাজ করত। এসব লোক জোরেসোরে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করত। আবার আরেক দিকে বিশ্ব নিপীড়ন সমর্থন করত, লুট করত ইরানী জাতির সম্পদ। তারা "মানবাধিকার রক্ষা সমিতির" সদস্য ছিল, কিন্তু কাজ করত সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য পূরণে। এ সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল হাসান নাজিহ। সে মুক্তি আন্দোলনেরও সদস্য ছিল। অস্থায়ী সরকার তাকে ইরানী জাতীয় তেল কোম্পানীর (এনআইওসি) পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি পদে নিয়োগ করে। সে এ পদে ছিল ৮ মাস এবং এ পদে থাকাকালীন বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বেই আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়া এনআইওসি'র আমেরিকান উপদেষ্টাদের বেতন তোলে। এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ইরানের বিচার বিভাগ কিভাবে কাজ করত। নাজিহর মত লোক, যে দৃশ্যতঃ শাহর বিরোধিতা করেছে, যদি বিচার ব্যবস্থার সদস্য হয়, তাহলেই অন্যান্য তথাকথিত আইনজীবীর অবস্থা অনুমান করা যায়।

পূর্ববর্তী সরকারের অপরাধী লোকদের বিচার যে এই বিচার ব্যবস্থাকে করতে দেয়া হবে না, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ রকম ব্যবস্থা বিপ্লবের প্রয়োজন মেটাতে

www.pathagar.com

পারে না, এ কথা প্রশ্নাতীত সত্য। ৭০ হাজারের বেশী ইরানী জনগণ হত্যা করেছে, এদেশকে আমেরিকার দাসে পরিণত করেছে, শাহের যে কর্মীরা, তাদের বিচারের ভার একটি দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার ব্যবস্থার ওপর অর্পণ করলে সকল বা অধিকাংশ অপরাধী নিরপরাধ হিসেবে খালাস পাবে অথবা স্বল্পমেয়াদে কারাদণ্ডিত হবে বা আদালতে তাদের সাথীদের খরচেই পালাবে। পূর্ববর্তী ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সকল বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিচার করা প্রয়োজন। কারণ তারা নীরব থাকার ফলে পাহলভী সরকারের দুর্নীতি, অপরাধ ও কুকীর্তি বাড়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে। অস্থায়ী সরকার বিপ্লব-পূর্ব বিচার ব্যবস্থা অক্ষত রাখতে এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী ও অপরাধীদের বিচারের জন্যে বিপ্লবী আদালতের কাজকে বিঘ্নিত করতে চেষ্টা চালায়। এটা বিপ্লবের ওপর অস্থায়ী সরকারের একটি বড় আঘাত। বিপ্লবী আদালতসমূহের অস্তিত্ব ইরানের ইসলামী বিপ্লবের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরে ইসলামী বিপ্লবী কমিটিসমূহের পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবী আদালতসমূহও গঠিত হয়।

ইসলামী অনুশাসনের ভিত্তিতে এসব আদালত পাহলভী সরকারের প্রধান ব্যক্তিদের বিচার এবং ইসলাম ও ইরানী জাতির সাথে মহা-অপরাধকারী একদল লোককে শাস্তিদান শুরু করে। এদের মধ্যে রয়েছে শাহের ১৩ বছরের প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোবায়দা, সাভাক প্রধান ফিল্ড মার্শাল নাসিরি, হাজার-হাজার লোকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কিছু সামরিক গভর্ণর এবং ইরানের অর্থনীতিকে পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তোলার জন্যে দায়ী কিছু পুঁজিপতি।

ইসলামী বিপ্লবী আদালতসমূহ সম্পর্কে এতই মিথ্যা রটনা করা হয়েছে যে, বিশ্বের জনগণের, এমনকি আমাদের ইসলামী বিপ্লবের বন্ধুদেরও এসব আদালতের কার্যধারা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ও যথাযথ ধারণা নেই। মিথ্যা বলা হয়েছে যে, ইরানে রক্তপাত শুরু হয়েছে, বিপ্লবী আদালতগুলো নিরপরাধী লোকদের মারছে, বিচার ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে নিরপরাধ মানুষদের, এমনকি উপযুক্ত হিজাব পরিধান করে না যেসব নারী, তাদের স্তন কাটা হচ্ছে আদালতের আদেশে। এ অপপ্রচার বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষতঃ ইউরোপীয় দেশগুলোর জনতার কাছে বিপ্লবকে কদর্যভাবে তুলে ধরেছে। এমনকি ইসলামী বিপ্লবের বহু সমর্থক ও দরদীর মনেও এতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

জেরুজালেমের এক ফিলিস্তিনী যুবক, যিনি একজন শিক্ষক ও কুদ্‌স দখলদার সরকারের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী বিক্ষোভের নেতা, তিনি এ মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রশ্ন করেন : "ইসলাম দয়া ও প্রেমের ধর্ম। ইরানের বিপ্লবী বিচারকরা পাহলভী সরকারের সাথে সম্পর্কিত লোকদের সাথে এমন রূঢ় আচরণ করে ?"

www.pathagar.com

তাকে প্রশ্ন করা হয়, ৭০ হাজার নিষ্পাপ ইরানী হত্যার বদলে কত জন হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত হবে? সে উত্তরে বলে, সম্ভবতঃ কয়েক হাজার হত্যা এ ক্ষেত্রে বৈধ বলে গণ্য হতে পারে। ফিলিস্তিনী ভাইটি যখন দেখল যে, তার প্রশ্নের সময় পর্যন্ত (১৯৭৯'এর জুন, বিপ্লবের বিজয়ের পরে ১৬ মাস) ৩০০ জনকেও ফাঁসি দেয়া হয়নি, তখন সে অবাক হয়ে যায়। সে জানতে চায়ঃ "দুনিয়ার জনগণকে এ কথা জানানো হয় না কেন? এরকম প্রচারের মুখে ইরান কেন চুপ করে থাকে?"

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের সৃষ্ট বাধাসমূহের কারণে ইরানের ইসলামী আদালতসমূহ যা অর্জন করেছে, তার বেশী অর্জন করতে পারে না। ইরানী জনগণ এসব বিচার-কার্য সমর্থন করার পাশাপাশি মনে করে, যারা দেশকে দাসে পরিণত করার কাজে, জনগণ হত্যা, ইসলামী সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন, কয়েক দশক স্থায়ী দমন-পীড়নমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি, দেশের সম্পদ অপচয় এবং বর্তমান বংশধরদের ধ্বংসের প্রান্তে টেনে নেয়ার কাজে শরীক ছিল, তাদের বিচারে আদালত প্রয়োজনীয় কঠোরতা দেখাতে পারছে না। "তুমি আল্লাহয় ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হলে, যারা তোমাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে আটক রাখে, তাদের করুণা কর না এবং একদল বিশ্বাসীর সামনে ঐ লোকদের শাস্তি দাও"। (২৪ঃ ২)

ইরানী জনগণ পবিত্র কোরানের আদেশ পালনের চেষ্টা করে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে বহিঃশত্রু ছাড়াও আভ্যন্তরীণ শত্রুদের অভ্যুদয় ঘটে, এমনকি খোদ প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী আদালতসমূহের কাজ কঠোরভাবে পরিচালনায় সর্বাত্মক বাধা দেয়, তখন কতদূর করা সম্ভব? সর্বাত্মক দুর্নীতি প্রসারের আগেই তা নির্মূল করা উচিত। বিপ্লব দেখেছে, প্রথম থেকেই পশ্চিমামুখী কিছু ব্যক্তি অত্যাচার, এমনকি অন্যায় বিচারের অভিযোগও তুলছিল। এমনকি প্রেসিডেন্ট সাম্রাজ্যবাদের জন্যে প্রচারের খাদ্য যোগায়।

বর্তমানে, ইরানের কারা ব্যবস্থায় কারা ওয়ার্ডেনদের বদলে বন্দীরাই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বন্দীরা অনেক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে। এমনকি কিছু বন্দীর জন্যে কয়েক দিন পর-পর একবার করে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের

১। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে বিপ্লবী আদালতের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত দু'বছরে বিপ্লবী আদালতের আদেশে মোট ৩২৬ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৫ জন অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল, অন্য ১৯ জন ফুরকান সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য। শাহের সরকারের সাথে সহযোগিতা ও জনগণ হত্যার দায়ে অবশিষ্টদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কারাগারে থাকা অবস্থাতেও যাতে সকল বন্দী সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে, সেজন্যে সরকারের সাধ্যমত এরকম বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কারা ওয়ার্ডেনদের আচরণ এমনই যে, অনেক ক্ষেত্রে বন্দীরা কারারক্ষীদের জন্য সমস্যা তৈরী করে। যেহেতু কারারক্ষীরা নিষ্ঠুর নয়, তাই কার্যতঃ বন্দীরাই তাদের মানসিকভাবে অত্যাচার করে। যেহেতু ইরানের ইসলামী বিপ্লব একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, তাই বিপ্লবী আদালতসমূহ ও কারাগারগুলো এ পথ অনুসরণ করে।

বিপ্লবের বিজয়ের পরে ইমাম খোমেনীর এক ডিক্রি বলে ইসলামী বিপ্লবী আদালতসমূহ গঠিত হয়। এসব আদালত বিপ্লবী পরিষদের অনুমোদনক্রমে কাজ করে। দেশের বিচার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এগুলো কাজ অব্যাহত রাখবে। বিপ্লব সম্পর্কিত মামলাসমূহের বিচার করবে। এ কাজ করবে সম্প্রতি ইসলামী পরামর্শক পরিষদে অনুমোদিত একটি বিল অনুসারে।

৩। ইসলামী বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী-(আইআরজিসি)

ইসলামী বিপ্লবী কমিটিসমূহ যে দর্শন থেকে উদ্ভূত, ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী-বাহিনীও সেখান থেকে সৃষ্ট। সেনাবাহিনীর ওপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের নেতৃত্ব ও জনগণ উপলব্ধি করেন যে, কিছু সামরিক কর্তার অ-বিপ্লবী মনোভাব এবং সামরিক সংস্থাসমূহে আমলতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলে সেনাবাহিনীর কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা পুরোপুরি রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত এটা আশা করা যায় না যে, সেনাবাহিনী একটি বিপ্লবী বাহিনী হিসেবে কাজ করবে এবং বিপ্লবের সামরিক প্রয়োজন মেটাবে। তাই, বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরে, ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। শান্তি রক্ষা ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরোধিতা করা ছাড়াও আইআরজিসি বিপ্লবী আদালতের শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও বিদেশী শত্রুদের মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে যায়।

বিজয়ের পরে নাজুক পরিস্থিতিসমূহে আইআরজিসি বিপ্লবের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা আত্মোৎসর্গের মনোভাবসম্পন্ন বিপ্লবী ও উৎসর্গীকৃত মনোভাবের যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেবা দানের উপযোগী করে এ সংগঠন গড়ে তুলেছে। বিপ্লবের বিজয়ের এক মাস অতিক্রম না হতেই আমেরিকার প্ররোচনায় প্রতিবিপ্লবীরা কুর্দীস্তান প্রদেশে গোলযোগ বাধায় ও রক্তপাত ঘটায়। আইআরজিসি গঠনের মাত্র কয়েক দিন পরেই সেনাবাহিনীর অঙ্গীকারাবদ্ধ একদল ভাইয়ের সাথে এ বাহিনীর কিছু উৎসাহী ও বিশ্বাসী যুবক ঐ প্রদেশে যায়। আইন-শৃংখলা কায়েম করে এক চক্রান্ত

www.pathagar.com

প্রতিহত করা হয় সেখানে। আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে রক্ষীবাহিনীর ত্যাগ ও নিষ্ঠা এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে ভাষায় তার প্রশংসা করা যায় না। আইআরজিসি'র কর্মতৎপরতা এমনই যে, ইমাম খোমেনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ "এ বাহিনী না থাকলে দেশও থাকবে না।" এ বিপ্লবী বাহিনীর কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বিপ্লবের বিজয়ের পরে দেশের অস্তিত্ব বিপ্লবী রক্ষী ও ইসলামী বিপ্লবী কমিটিসমূহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখনও বিপ্লবের ধারা অব্যাহত রাখা রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল।

ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে, আইআরজিসি ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবের জন্যে উৎসর্গ করেছে বহু শহীদ। আভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে যেমন, অনুরূপভাবে ইরাকের সাথে যুদ্ধেও এই বিপ্লবী সংগঠনের একটি নির্ধারক ভূমিকা রয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুরা সবসময়ই রক্ষীবাহিনীর ভাইদের সমালোচনা করেছে। তারা জানে, বিপ্লব ত্যাগ করাতে ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অনীহা করে তুলতেই এসব অভিযোগ। এ কারণেই তারা নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে আরো সংকল্পবদ্ধ হয়, ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লব ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে প্রহরা দেয়।

৪। ত্রাণ কমিটি

পাহলভীর শাসনের সময় এ দেশের বিপুল রাজস্ব আয় সত্ত্বেও বহু ইরানী দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে জীবন কাটাত। এখনো এ অবস্থা রয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে সময় ও বিশাল অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রয়োজন। দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এমনই ছিল যে, অভাবীরা নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে সুদমুক্ত ঋণ পেত না। বিপ্লবে অংশগ্রহণের সময় বা তারও আগে এতিম ও বিকলাঙ্গ মানুষ দেশের ওপর আর্থিক ও কল্যাণভার হিসেবে দেখা দেয়। যেসব লোকের অভাব রয়েছে, অথচ বর্তমান সংস্থাগুলো সে অভাব মেটাতে পারছে না, তাদের ত্রাণ সামগ্রী যোগাতে একটি বিশেষ বিপ্লবী ত্রাণ প্রতিষ্ঠান গঠনের মত পরিস্থিতি ছিল।

"ইমাম খোমেনীর ত্রাণ কমিটি" নামে তেহরানে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ক্রমে তা' সারা দেশে শাখা খোলে। ১৯৮০ সালের ৩রা মার্চ থেকে ঐ বছরেরই ৭ই জুলাই পর্যন্ত চার মাসে ত্রাণ কমিটি সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত মানুষদের যে ঋণ দিয়েছে, কেবল তা-ই এ কমিটির গুরুত্ব তুলে ধরতে যথেষ্ট। এ সময়ের মধ্যে কমিটি ৩ হাজার ১৯ জনকে ৪ কোটি ৪৭ লাখ ১৮ হাজার রিয়াল সুদমুক্ত ঋণ দিয়েছে। এ অর্থের ৪০ শতাংশ ঋণ পরিশোধে, ২০ শতাংশ বিয়ে, ১৯ শতাংশ পুঁজি হিসেবে, ১৯ শতাংশ গৃহ সংস্কারে এবং ২ শতাংশ চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হয়। অপরদিকে, এ কমিটি ১৯৮০ সালের ৭ই জুলাই পর্যন্ত ১শ' ২৬ কোটি

www.pathagar.com

৭৬ লাখ ২০ হাজার ২শ' ৩৭ রিয়াল বাজেয়াপ্ত করে বেআইনী ঋণ প্রদানে নিয়োজিত লোকদের কাছ থেকে এবং ঐ অর্থ উপযুক্ত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

৫। জিহাদ-ই-সাজান্দেগি

অধিকাংশ উপনিবেশের মত ইরানেও গ্রামের জনগণ বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যবস্থা এদের ছিল না। পাহলভী শাসনের সময় এ অবস্থা ছিল ব্যাপক। শাহ সরকার নগরগুলোকে, যেগুলোতে পর্যটকরা আসত বা যেগুলো চলাচল পথে অবস্থিত ছিল, রং ও চাকচিক্য দেবার চেষ্টা করত। সরকারের প্রচার ব্যবস্থা যাতে দেশকে উন্নয়নমুখী বলে হাজির করতে পারে, সেজন্যেই এটা করা হত। এসব প্রদর্শনীকে গ্রামাঞ্চলের বঞ্চিত জনতার শ্রমে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। অথচ এ বাস্তব তথ্য আড়াল করে বিশ্বের জনগণের সামনে ইরানের নগরগুলোর উপরোক্ত চিত্র উপস্থাপন করা হত। নগরগুলোতেও বহু লোকের অবস্থা ছিল খারাপ এবং দূরের জেলাসমূহে, এমনকি তেহরানের দক্ষিণাঞ্চলে বহু পরিবার পানি ও বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদেরকে গর্তের মধ্যে বাস করতে হত।

গ্রামাঞ্চল উন্নয়ন, আবাদ ও দেশের প্রত্যন্ত এলাকাসমূহে বঞ্চিত জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে ইমাম খোমেনীর ডিক্রিবলে ১৯৭৯ সালের ১৭ই জুন (অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের চার মাস পরে) "জিহাদ-ই-সাজান্দেগি" নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়। তেহরানে স্থাপিত হয় এ সংগঠনের সদর দফতর। সারা দেশে শাখা খোলা হয়। গ্রামবাসী ও বঞ্চিতদের কল্যাণে এ সংগঠন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। জিহাদ-ই-সাজান্দেগি ইসলামী বিপ্লবের সেবায় এক ব্যতিক্রমী সংগঠন এবং ইরানী শ্রমজীবী ও সৎ জনগণকে মূল্যবান সেবা দিচ্ছে। জনপ্রিয়তার কারণে এ প্রতিষ্ঠানে কলেজ স্নাতক, যুবক, বিভিন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞ, পুরপ্রকৌশলী, চিকিৎসা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কর্মী, প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা ও বয়সের লোকেরা সমবেত হয়েছে। এ সংগঠন জনগণের সেবায় এদের কাজে লাগাচ্ছে। এখানে কর্মরত পেশাজীবীরা ন্যূনতম বেতন নিচ্ছে, অথচ সর্বোচ্চ নিষ্ঠা প্রদর্শন করছে। নিম্নে উল্লিখিত হয়েছে জিহাদ-ই-সাজান্দেগির সেবা-কর্মের বিবরণ। এ থেকে বলা যায়, এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম কার্যকর শাখা এবং বিগত দিনগুলোতে ইরানের গ্রামাঞ্চল যে বঞ্চনার শিকার হয়েছে তা থেকে উন্নীত করার সম্ভাবনা এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। জিহাদ-ই-সাজান্দেগি'র প্রথম দু'বছরের কর্মতৎপরতার হিসাব নীচে দেয়া হল। এগুলো ১৯৮১'র ১৫ই জুনে সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ছক—১

জিহাদ-ই-সাজান্দেগির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

আদর্শগত বিষয়ে পাঠদান	৭,৬৮২	টি অধিবেশন
সাক্ষরতা বিষয়ে পাঠদান	৭,৮৮১	,, ,,
পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার শাখা প্রতিষ্ঠা	১২,৬৩৫	,, ইউনিট
চলচ্চিত্র ও নাট্য কর্মসূচী	২৬,৬৬৮	
বিভিন্ন প্রদর্শনী	৩,৩১৪	
গ্রামাঞ্চলে গঠিত ইসলামী পরিষদ	৫,৬১৫	টি গ্রামে
বক্তৃতাদান	১৭,৮৬০	টি অধিবেশন
বিনামূল্যে বিতরণ করা বই	৪২,৭২,৯৫২	খণ্ড
সাময়িকী ও অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ	৭,১২,৪১৯	
টেপে ধারণকৃত বক্তৃতা বিতরণ	৬৫,৫৯৪	টি টেপ
পোস্টার ও ছবি বিতরণ	৩০,৬২,২৪২	

ছক—২

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সার্ভিস

বিনামূল্যে চিকিৎসা	১৫,০৬,৭০২	জন
জখম শুশ্রূষা ও ইনজেকশন দান	১১,৭৩,৪২৯	জন
টীকাদান	৬,৯২,৫৮৪	জন
গ্রামে পাঠানো মেডিক্যাল দল	৮,৩৪৮	টি দল
স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ	১,২৩,৪৮৫	জন
হাসপাতালে ভর্তি করা রোগী ও মাদকদ্রব্য আসক্ত ব্যক্তি	৮৬,১০১	জন

ছক—৩

কৃষি ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা

বীজ বিতরণ	৫৫,৯৫৪	টন
সার ,,	২,৫৬,৬৩২	,,
কীটনাশক ,,	৯,৮৯,১৮৩	কিলোগ্রাম
চারা ,,	৬,৪৭,৮৫০	টি
গ্রামবাসীদের দেয়া ট্রাক্টর	১,৪৯১	ইউনিট
,, ,, অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি	৫,০৯১	,,
কৃষকদের দেয়া ঋণ	১৫০০,০০,০০,০০০	রিয়াল
জমি আবাদে দেয়া সাহায্য	১১,৬৩,২৭৮	হেক্টর
ফসল তোলায় দেয়া সাহায্য	১,৪৪,৯৪৪	হেক্টর
জিহাদ-ই সাজান্দেগি কর্তৃক আবাদ করা জমি	৬১,৭৭৯	হেক্টর
ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত হয়েছে	৪,০৫৭	ইউনিট

www.pathagar.com

ছক—৪

গবাদী পশু পালন সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা

গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহপালিত পশু বিতরণ	২৭,৮০৫	টি
পশু-খাদ্য বিতরণ	১,২৯,৫৭৫	মেট্রিক টন
গৃহপালিত পশুর টীকাদান	১,৩২,২৬,৯৫৭	টি
গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা	৪৬,২২,১২৭	টি
হাঁস-মুরগী টীকাদান	৪৭,৮০,৯৩০	টি মুরগী
খোয়াড়ে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	৪৯,৯১৯	ইউনিট
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী কেন্দ্র স্থাপন	৪২৪	টি কেন্দ্র

ছক—৫

উন্নয়ন পরিকল্পনা

কাজের নাম	সম্পূর্ণ হয়েছে	নির্মাণাধীন	সংস্কারকৃত	
স্কুল	১,৯৯৭	১,৩৫৭	৪,৮৮৭	ইউনিট
মসজিদ	৪৮৪	২৯৪	১,৪২৯	,,
গণ-গোছলখানা	১,৪৬৯	৮৪৪	১,৮৮৮	,,
ক্লিনিক	৮০	৫২	১৪৩	,,
সমাধিস্থল	৩৬৭	১৩৫	১৮৭	,,
অভাবী গ্রামবাসীদের জন্য বাড়ী	১,৯৩৪	৩৭৭	২,৯৯০	,,
পানির ট্যাংক	৩৬১	২৯	১৪৯	,,
স্যানিটারী পায়খানা	৫,১২১	৬১২	৫১৮	,,
ইঞ্জিন ঘর	২৬৮	৭৭	৪৫	,,
গ্রামে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	২,১৩৪	৭৯২	৮১৩	গ্রাম
পানি সংরক্ষণাগার	১,১৮২	২৬৫	১৬৬	,,
গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ	৯৬২	২৫৭	১৬২	গ্রাম
পাথর বিছানো রাস্তা	৪,১৭৬ কিঃ মিঃ	২,৬৪৩ কিঃ মিঃ	২,৮৮১	কিঃ মিঃ
গ্রামীণ পথ	১১,১৩৬ ,, ,,	৩,১৫১ ,, ,,	৪,৮০৫	,,
মোট নির্মিত রাস্তা	১৫,৩১২ ,, ,,	৫,৭৯৪ ,, ,,	৭,৬৮৬	,,
সেতু নির্মাণ	৪,৬২৪ ,, ,,	৬৯৫ ,, ,,	৪২৯	টি

www.pathagar.com

ছক—৬

পানি সেচ

কাজের ধরন	সম্পূর্ণ হয়েছে	নির্মাণাধীন	সংস্কারকৃত
ভূগর্ভস্থ খাল	২,৪৯৯ কিঃ মিঃ	১,৪০৫ কিঃ মিঃ	৩,০৭১ কিঃ মিঃ
নিষ্কাশন	২৬,৪৫৪ ,,	৬৪ ,,	৩৪১ ,,
কূপ খনন	১,০৮৫ ,,	৬৭ ,,	৬১৬ ,,
অগভীর কূপ খনন	১,৯৬৭ ,,	৭৯ ,,	২২৮ ,,
পানি সেচের ব্যবস্থা	১২২ ,,	৯২ ,,	৯,৭২৯ ,,
মাঁটির বাঁধ ও বেড়ী বাঁধ	২,১৮৯ ,,	৬৯ ,,	৩৯২ ,,
কৃষি কাজে ব্যবহারের পুকুর	১,০৯৬ ,,	১৮ ,,	৪৬৩ ,,

ছক—৭

যুদ্ধ সম্পর্কিত কর্মতৎপরতা

কাজের ধরন	সংখ্যা/ইউনিট
রণাঙ্গনে রাস্তা নির্মাণ	৯২১ কিলোমিটার
খাল খনন	১৩৩ ,,
রাস্তা মেরামত ও নিয়ন্ত্রণ	১,০৬৯ ,,
শক্তিশালী অবস্থান নির্মাণ	২,৯৯৬ ইউনিট
সামরিক বিমান বন্দর নির্মাণ	৮ টি
সেতু নির্মাণ ও মেরামত	১১৫ টি
ভারী যন্ত্রপাতি মেরামত	১,৬৫১ ইউনিট
হাল্কা ,, ,,	৩,৮৭২ ,,
যুদ্ধ উদ্বাস্তুদের সাহায্য	১,০০,০০০ জন
উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন	২ টি
হেলিপোর্ট ও হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার নির্মাণ	১১ ইউনিট
রণাঙ্গনে গোছলখানা নির্মাণ	১০ ,,
হাসপাতাল নির্মাণ	৬ ,,
অস্ত্রাগার নির্মাণ	৯৮ ,,
অস্থায়ী অশ্রায়স্থল নির্মাণ	৪,২১০ ,,
বিমান হামলা থেকে আশ্রয়ের ঢালাই করা আশ্রয়স্থল নির্মাণ	৬৩ ,,
জেটি নির্মাণ	২ টি
ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ	২ ইউনিট

www.pathagar.com

ছক—৮

যুদ্ধ এলাকায় পাঠানো সাহায্য

ধরন	পরিমাণ	
ভারী পরিবহণ যান	৫৬৪	ইউনিট
হাল্কা ,, ,,	১,২৭৫	,,
ওষুধ ,, ,,	১২,৩৮,১৪৪	প্যাকেট
খাদ্য ,, ,,	৫০,২৩৬	মেট্রিক টন
খুচরা যন্ত্রাংশ	৯১,৭৫৯	টি
কাপড় এবং রান্নার সামগ্রী	২১,৪৪,৫৩৮	টি
নগদ অর্থ	৬০,০২,৪২,৩০৯	রিয়াল
রণাঙ্গনে ব্যবহারের জন্য গবাদী পশু	১১,৫০৯	টি
এ্যাম্বুলেন্স	৩৮	ইউনিট
মেডিক্যাল দল	৬৩	দল
স্বেচ্ছাসেবক	১,৬৩৮	জন

৬। সমাবেশ সংগঠন

ইরানের ইসলামী বিপ্লব বর্তমানে যে অবস্থায় পড়েছে, ঠিক তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কোন বিপ্লবী দেশের জন্য সবসময়ই ঐ সব বৃহৎশক্তি বা তাদের আশ্রিত রাজ্যের হামলার সম্মুখীন হওয়া অথবা তাদের দেশের ভেতরে তাদের ভাড়াটেদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার বিপদ সব সময়ই থাকে। তাই এরকম দেশের জনগণকে সব সময়ই আভ্যন্তরীণ বা বাইরের হামলা মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। সকল শহর-গ্রামে জনগণকে প্রস্তুত রাখা এবং জরুরী অবস্থার সময়ে ঠিকমত সমাবেশ করার জন্যে সমাবেশ সংগঠন গঠিত হয়।

প্রথমে সমাবেশ সংগঠন ছিল একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। পরে, ১৯৮০ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী পরামর্শক পরিষদের অনুমোদনের পরে এ সংগঠন ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর সাথে একীভূত হয়। এ সংগঠনের ছোট ছোট ইউনিট গঠিত হয় সকল জেলায়। সাধারণতঃ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মসজিদ বা কারখানা। সমাবেশ সংগঠন ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছে লাখ-লাখ সেচ্ছাসেবক এবং এভাবে বীর ইসলামী বাহিনীকে দিয়েছে মূল্যবান ও কার্যকর সেবা। বিপ্লবের সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংগঠনের অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে খুবই উপকারী ও কার্যকর হয়েছে।

www.pathagar.com

৭। গৃহ সংস্থান ফাউণ্ডেশন

রাজতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে ইরানী জাতি যেসব বিপুল সমস্যা পেয়েছে. তার মধ্যে একটি হচ্ছে গৃহ সংস্থানের সমস্যা। পাহলভী সরকারের আমলে, বিশেষ করে শাহ শাসনের শেষ দশটি বছরে দেশকে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের ওপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চালানো হয়। এ চেষ্টা চালায় তারা, যাদের এটাই ছিল একমাত্র কাজ। তারা পশ্চিমা ধরনের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স তেরী করে। অথচ এগুলো ইরানী জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্যে ভৌগলিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপযুক্ত ছিল না। দিন-দিন গ্রামের লোকের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। প্রত্যেক মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন আবাসিক ব্যবস্থা। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের লোকদের এ ব্যবস্থাটি ছিল না। যেসব পরিবারের ঘর ছিল, সেগুলো ছিল এতই নড়বড়ে, দুর্বল যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে তা টিকত না। যাদের ব্যবস্থা ছিল গৃহ সংস্থানের, তারা সবাই রাজ দরবারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এরা নিজেদের মর্জি-মাফিক গৃহ সংস্থানের আয়োজন করে পকেট ভারী করত অর্থ দিয়ে আর লুটের অর্থ দিয়ে সয়লাব করত আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকরা গৃহহীনই রয়ে গেল। দিন-দিন তাদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা বাড়তে লাগল। শাহের বিখ্যাত প্রাসাদগুলো থেকে সামান্য দূরেই তেহরানের দক্ষিণে এ ধরনের দারিদ্র্যময় জীবন নজরে পড়ত। একই নগরে রাজ দরবারের রমনীরা, শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত লোকেরা ও লুটেরারা বিলাসী স্নানপাত্রে দুগ্ধধারায় গা ধৌত করত, অথচ অনেক মানুষ তাঁবু ও মাটির গর্তে থাকত। মাটি ছিল এদের বিছানা, ছাদ ছিল আকাশ। এ রকম অবস্থার মধ্যে ইসলামী বিপ্লব জয়লাভ করে এবং দেশের নয়া নেতারা আরো অনেক স্তূপাকার সমস্যার সাথে এ সমস্যার সম্মুখীন হন। ইমাম খোমেনী প্রথম দিন থেকেই শ্রমিক ও সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের পানি ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করেন। তিনি বঞ্চিতদের জন্যে গৃহ নির্মাণে সাহায্য করতে একটি সরকারী ব্যাংকে টাকা জমা দিতেও জনগণের প্রতি আহবান জানান। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি, ইমাম খোমেনীর ডিক্রিবলে "গৃহ সংস্থান ফাউণ্ডেশন" নামে একটি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। বঞ্চিত জনগণের গৃহের সংস্থান করার দায়িত্ব থাকবে এ প্রতিষ্ঠানের। বিপ্লবী ইরানী জনগণ তাদের নেতার প্রস্তাব আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাল এবং বিপুল অর্থ জমা দিল। এর মধ্য দিয়েই প্রশস্ত হল গৃহ সংস্থান ফাউণ্ডেশনের তৎপরতার পথ।

একটি সুন্দর বাড়ী থেকে বঞ্চিত ছিল যে পরিবারসমূহ, গৃহ সংস্থান ফাউণ্ডেশন সেই লাখ-লাখ পরিবারকে দিল বাড়ী। মানুষের দানেব অর্থে এ ফাউণ্ডেশন শহর-নগর গ্রামে নির্মাণ করে বাড়ী এবং সেগুলো হস্তান্তর করে প্রকৃত অভাবী

www.pathagar.com

পরিবারের কাছে। বিপ্লবের বিজয়ে পরে এভাবে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যত পরিবারকে বাড়ী দেয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের কর্মতৎপরতা শীর্ষক ৬৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

৮। মুস্তাজাফিন ফাউণ্ডেশন

(নিপীড়িতের ফাউন্ডেশন)

শাহ ও অসাধু সহযোগীরা ইরানী জনতার শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের জন্যে বানিয়েছে প্রাসাদমালা ; স্থাপন করেছে বিভিন্ন কোম্পানী, কারখানা, ব্যবসা, পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র, কৃষি সমবায় দোকান ; নিজেদের সুখভোগী জীবন যাপনের জন্যে সঞ্চয় করেছে বিপুল সম্পদ ; দুদিনের আশংকায় ইউরোপীয় ও আমেরিকান ব্যাংকগুলোতে জমা রাখে উদ্বৃত্ত অর্থ। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ে এই লুটেরারা পলায়ন করে। এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেগুলো রূপান্তরিত হয় সরকারী সম্পত্তিতে। এ সম্পত্তি এত বিপুল ছিল যে, এগুলো সামলানোর জন্যে প্রয়োজন হয় আরেকটি পৃথক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার। প্রাসাদ, হোটেল, প্রেক্ষাগৃহ, ফল বাগান, খামার, কোম্পানী, কারখানায়, এমনকি সংবাদপত্র থেকে বাজেয়াপ্ত সম্পদ তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় মুস্তাজাফিন ফাউণ্ডেশন। এ ছাড়া জুয়াচুরি ও তছরূপের দায়েও বহু পুঁজিপতির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মুস্তাজাফিন ফাউণ্ডেশন বাজেয়াপ্ত সম্পদ ও কোম্পানীসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ফাউণ্ডেশনের উপার্জিত অর্থ সমাজের বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রেণীর কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এখন পর্যন্ত বহু পরিত্যক্ত ও বাজেয়াপ্ত ভবন গৃহহীন পরিবারগুলোকে দেয়া হয়েছে। সম্পদ বাজেয়াপ্ত, তা বঞ্চিতদের মধ্যে বণ্টন এবং বঞ্চিতদের কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এ সম্পত্তি থেকে অর্জিত অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে মুস্তাজাফিন ফাউণ্ডেশন সমাজ ও বঞ্চিতদের মূল্যবান সেবা প্রদান করছে।

৯। শহীদ ফাউণ্ডেশন

ইরানের ইসলামী বিপ্লবে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিকলাঙ্গ হয়ে গেছেন যারা, তাদের পরিবার ভরণ-পোষণে ইমাম খোমেনীর ডিক্রিবলে শহীদ ফাউণ্ডেশন গঠন করা হয়। আজ পর্যন্ত এ ফাউণ্ডেশন নিজস্ব উদ্যোগে লাখলাখ শহীদ ও বিকলাঙ্গ পরিবারের সেবা করছে। এ ফাউণ্ডেশন "শহীদ" নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে এ সাময়িকীটি শহীদ ও বিকলাঙ্গদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার মাধ্যম।

যেসব শহীদ ও বিকলাঙ্গ সংগ্রামীর পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন রয়েছে, তারা এ ফাউণ্ডেশন থেকে সাহায্য পায়।

www.pathagar.com

১০। সাক্ষরতা আন্দোলন

নিজেদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক ও সাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কে পাহলভী শাসকবর্গের ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও ঐ সরকারের পতনের সময়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরানী জনগণের অক্ষরজ্ঞান ছিল না। এই বঞ্চনার কারণ, রাজ-সভাসদ, তথাকথিত অভিজাত ও শাহ সরকারের সাথে সম্পর্কিত লোকদের সন্তানরা মনে করত না যে; ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলসমূহ তাদের জন্যে উপযুক্ত। তাই তারা লেখা-পড়া করার জন্য যেত ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশসমূহে, অপচয় করত অর্থের। অথচ এ অর্থ বঞ্চিত জনতার শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা যেত। এর পর উচ্চশ্রেণীর ঐ সদস্যরা দেহ-মনে পশ্চিমা সংস্কৃতির ছাপ নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চর হিসেবে ইরানে প্রত্যাবর্তন করত। তারা দেশ বিক্রি এবং জাতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকৃত করার কাজ করত। জনগণকে বোকা বানানোর জন্যে শাহের দরবার থেকে যাদের নিয়োগ করা হত, তার মিথ্যা প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে নির্বিঘ্নে চালাত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ-কর্ম।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে সকল ইরানীর জন্যে একটি ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করা জরুরী ও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের জনগণ জানত যে, উপনিবেশবাদী ও তাদের এ দেশীয় দাসদের কাজ থেকে যে দুর্ভোগ পাওয়া গেছে, তার জন্যে অংশতঃ দায়ী হচ্ছে নিরক্ষরতা। এ প্রেক্ষিতে এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দূরীকরণে ১৯৮০'র ৮ই জানুয়ারী ইমাম খোমেনীর ডিক্রিবলে "সাক্ষরতা আন্দোলন" নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থা গঠনকাল থেকে মূল্যবান সেবামূলক কাজ করছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র এমনই এক ব্যবস্থা, যার সাথে বিরাজিত কোন শাসন ব্যবস্থার মিল নেই। যদিও এর কোন কোন অংশের সাথে অন্য কিছু সরকারের কিছু সামঞ্জস্য থাকতে পারে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র একটি গণমুখী ব্যবস্থা, এটা পার্লামেন্টারী সংগঠনের ভিত্তিতে গঠিত ; এতে দেশ পরিচালনার জন্যে নির্বাহী, বিচার ও আইন বিভাগকে পৃথক করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা একটি ইসলামী আইন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। তাই একটি গণমুখী ব্যবস্থা ছাড়াও এটা ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থাও। অর্থাৎ ইসলামী প্রজাতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ওপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের ওপর জনগণেরই সার্বভৌমত্ব। অথচ একটি অনৈসলামিক প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থায় জনগণকে শাসন করে জনগণই এবং জনগণের ওপর কোন ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্ব নেই।

www.pathagar.com

তাই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাথে বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য হচ্ছে যে, অনৈসলামিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের নীতিমালা এবং শাসন ব্যবস্থার মৌল কাঠামো জনগণের ওপর নির্ভর করে ; কারণ জনগণই নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সরকার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রে কেবল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সরকার পদ্ধতি নিরূপণের ক্ষেত্রেই জনতার ইচ্ছা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু শাসন ব্যবস্থার নীতিমালা ও মৌল কাঠামো ইসলামী বিধান ও ঐশী আদেশের ভিত্তিতে গঠিত। ইসলামী প্রজাতন্ত্রে জনগণই ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ঐশী আদেশ ও শিক্ষা ভিত্তিক ব্যবস্থার পক্ষে অবাধে ভোট দেয়। যেমন, ইরানী জনগণ একবার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত নীতিমালার জন্যে এবং দ্বিতীয়বার দেশের সাংবিধানিক আইনের জন্যে ভোট দিয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি ঃ যে ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা অনুসারে ঐশী আদেশ ও বিধান জনগণকে শাসন করে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে ঃ

ধারা ঃ ২য়

ইসলামী প্রজাতন্ত্র হচ্ছে নিম্নবর্ণিত বিশ্বাসসমূহের ভিত্তিতে গঠিত একটি ব্যবস্থা ঃ

১। লা শরীকাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)। তাঁর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বিধান তাঁরই স্বত্বাধীন, তার আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

২। ঐশী প্রত্যাদেশ এবং আইন প্রণয়নে এর মৌল ভিত্তি।

৩। পুনরুজ্জীবন এবং আল্লাহ'র রাহে মানব জীবনের বিবর্তনে এর গঠন-মূলক ভূমিকা।

৪। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐশী বিচার ও ঐশী বিধান।

৫। ইমামত এবং ইসলামী বিপ্লব অব্যাহত রাখায় এর ইতিবাচক নেতৃত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

৬। মানুষের মর্যাদা এবং মানবতার মহান মূল্য। এটা মানুষকে, অবাধ ইচ্ছা ও দায়িত্বকে অতিক্রম করে। এটা ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর সাহায্যে ঃ

(ক) কোরান, হাদিস ও ইমামদের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের অব্যাহত অনুশীলন।

(খ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানুষের অগ্রগতিসমূহের ব্যবহার এবং এগুলোর বিকাশে প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

(গ) সকল ধরনের নিপীড়ন অস্বীকারকরণ, নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ না করা। স্বৈরাচারকে ও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি।

এ ছাড়াও ইসলামী প্রজাতন্ত্র সরকার ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার আরেকটি পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যসূচক বিষয়টিকে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে বলা হয়েছে "বেলায়েত-ই-ফকিহ"। এর অর্থ সরকারের পদ্ধতি ও কার্যক্রম ইসলামী বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না তা তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। "ইমাম" খেতাবে ভূষিত হয়ে এ দায়িত্ব পালন করেন, 'বেলাই ফকিহ", এতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার সকল ঐশী দিক পূর্ণাঙ্গ হয়। এভাবে ইমাম ও উম্মার মধ্যেকার দ্বিমুখী সম্পর্ক গঠন করে উম্মা-ইমাম ব্যবস্থা। পরে এ অধ্যায়ে "বেলায়েত-ই-ফকিহ" নিয়ে আলোচনা হবে।

কিছু দেশে "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের" নামে যা আছে, তার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। ঐসব সরকারের সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পার্থক্য ইসলাম ও ভুয়া পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যেকার ফারাকের মতই। পাকিস্তান, সউদী আরবসহ অন্যান্য দেশে শাসকরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা ইসলামের পক্ষে বলে নিজেদের জাহির করে। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের নামে জনগণকে ধোঁকা দেয়া এবং জনগণকে উপনিবেশবাদ ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ফাঁদে আরো ভালভাবে আটকানো। এসব সরকার নিজেদের শুদ্ধতা দেখাতে ও নিজেদের কাজের যথার্থ প্রমাণ করতে নিজেদের "ইসলামী" হিসেবে অভিহিত করে। "ইসলামী সরকার" নামের আড়ালে এরা পূর্ব ও পশ্চিমের ভাড়াটে হিসেবে কাজ করে। একইভাবে পাহলভী শাসকগোষ্ঠীও ইসলামের নামে বি-ইসলামীকরণের কাজে ব্যস্ত ছিল। সত্য হচ্ছে, বর্তমানে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিশ্বে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের চমৎকার উদাহরণ।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার স্তম্ভসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যবস্থা দু'টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ জনতার ভোট ও আল্লাহ্‌র আইন। এ দু'টির রয়েছে নির্দিষ্ট আওতা ও সীমা।

১। জনতার ভোট

ইসলামী ব্যবস্থা জনতার ভোটের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ জনগণ অবাধে এটা বা অন্য কোন ব্যবস্থা বেছে নিতে পারে। বিপ্লবের সময় ইরানের জনগণের দেয়া শ্লোগান থেকে দেখা যায়, তারা একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জন্যে আবেদন জানায়। ১৩৫৮'র ১০ ও ১১ই ফারভারদিনে (১৯৭৯'র ২২ ও ২৪শে এপ্রিল) বিপ্লবের বিজয়ের ৪৭দিন পরে জনগণ ভোট দেয়। গণভোটে প্রদত্ত ২ কোটি ১লাখ ৬৫ হাজার ৪শ' ৮০টি ভোটের মধ্যে ৯৮ দশমিক ২ শতাংশ

www.pathagar.com

রাজতান্ত্রিক সরকারকে ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকারে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেয়। বিপ্লবের বিজয়ের ১শ'৭০ দিন পরে আরেকবার ভোট নেয়া হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে এ ভোট নেয়া হয়। সংবিধান প্রণয়ন করাই ছিল এ পরিষদের কাজ। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত সংবিধান স্বয়ংভাবে বৈধ, তবুও ১৩৫৮'র ১১ ও ১২ই আজারে (১৯৭৯'র ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর) সংবিধান নিয়ে ভোট হয়। ১ কোটি ৫৬ লাখ ১২ হাজার ১শ' ৩৮ জন এর পক্ষে ভোট দেয়। কয়েকটি এলাকায় কিছু রাজনৈতিক উপদল সৃষ্ট গোলযোগের কারণে বহু লোক ভোট দিতে পারেনি।

ইসলামী পরামর্শক পরিষদ (মজলিস) সদস্যবৃন্দ ও প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টের পরামর্শে ও মজলিসের অনুমোদনসূচক ভোটের মাধ্যমে গঠিত হয়। এটা জনগণের অপ্রত্যক্ষ ভোটেরই মত। রাজ্য, শহর, নগর, জেলা, গ্রাম এবং উৎপাদন ও শিল্প ইউনিটসমূহের পরিষদগুলোতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় জনতার প্রত্যক্ষ ভোটে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানের ১০০ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

জনগণের সহযোগিতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে প্রত্যেক গ্রামীণ এলাকা, জেলা, নগর, শহর ও প্রদেশের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, গ্রাম, জেলা, নগর, শহর বা প্রাদেশিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে চলবে এবং এসব পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার নীতিমালা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে আইন অনুসারে এসব পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীর যোগ্যতা, এদের দায়িত্ব, নির্বাচন পদ্ধতি, এসব পরিষদের তত্ত্বাবধান এবং নেতৃবৃন্দের বিষয়সমূহ নির্ধারিত হবে।

অর্থাৎ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার মৌল নীতিটি হচ্ছে জনগণের ভোট, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। জনগণই নিজেদের অবাধ ভোটের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা, সংবিধান, আইনসভা সদস্য ও নির্বাহী প্রধানদের নির্বাচন করে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী নিয়ে গণভোটের আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানের ৫৯তম ধারায় বলা হয়েছে ঃ

প্রতিটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আইনগত ক্ষমতা একটি গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়। এ ধরনের গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব মজলিসের দু-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

www.pathagar.com

এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সরকারী পদ, অর্থাৎ নেতৃত্ব অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। সংবিধানের ৫ম ধারায় বলা হয়েছে ঃ

দ্বাদশ ইমামের অনুপস্থিতিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের নেতৃত্বদান ও জনগণকে পরিচালনা করার দায়িত্ব একটি ন্যায়ানুগ, ধার্মিক, ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞক, যুগ সচেতন, সাহসী, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিশিষ্ট ব্যক্তির, যার সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জানে ও যাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। যদি কোন আইন বিশারদের সেরকম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, তাহলে উপরোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আইন বিশারদদের সমন্বয়ে একটি নেতৃত্ব পরিষদ এ আইনের ১০৭ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে।

২। ইসলামী বিধানসমূহ

ইরানে বিরাজমান ও জনগণ গৃহীত ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সবকিছু অবশ্যই ইসলামী নিয়ম-কানুন অনুসারে হতে হবে। আসমানী ধর্মের বিধানের সাথে সঙ্গতিহীন কোন আইন বা বিধি উত্থাপন বা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এটা হচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তম্ভ। সংবিধানের ৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী, আর্থিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, রাজনৈতিক, ইত্যাদি আইন ও বিধি ইসলামী বিধান ভিত্তিক হওয়া উচিত। অভিভাবক পরিষদের আইন বিশারদগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেয়া সকল বিধি-বিধান এবং সংবিধানের অন্য সকল ধারা এই ধারা (৪র্থ) দ্বারা পুরোপুরি ও সার্বজনীনভাবে চালিত।

"ইসলামী প্রজাতন্ত্র" দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত ঃ "ইসলামী" ও "প্রজাতন্ত্র"। এতে জনগণের ভোটের-প্রজাতন্ত্রের কথা রয়েছে এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইসলামী বিধানসমূহ। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারাই সরকারের পদ্ধতি ও প্রকৃতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সরকারের প্রকৃতি এককভাবে ঐশী বিধানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এসব বিধান ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ পায়। অন্যান্য সরকার পদ্ধতির চেয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকার পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের ওপর আমরা গুরুত্ব দিতে চাই। দীর্ঘ আলোচনা না করেও সহজ যৌক্তিক বিবেচনায় এ শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো যায়। আল্লাহ-বিশ্বাসী সকলেই স্বীকার করবে যে, ঐশী বিধান অনুসারে গঠিত সরকার মানুষের প্রণীত আইন-কানুন ভিত্তিক সরকারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিছু লোক সমস্যায় পড়ে যায় এই ভেবে যে, ১৪০০ বছর আগে মানব সমাজের একটি আইন কিভাবে আমাদের আধুনিক

www.pathagar.com

ও সদা-পরিবর্তনশীল বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যে উপযোগী হতে পারে। এর উত্তর খুবই সোজা। ইসলামী বিধান দু'ধরনের ঃ স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। স্থায়ী বিধান হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ। যেহেতু মানব চরিত্র অপরিবর্তনীয়, তাই এসব বিধান শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ স্থির, অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের প্রয়োজন এবং মানব সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদির সাথে সাথে যেগুলো যে অনুসারেই পাল্টায়, সেগুলোই পরিবর্তনশীল বিধান। ইসলামী আলেমরা কোরান, সুন্না, আকল্, ইজমা অনুসারে এসব পরিবর্তনশীল বিধান বলেন। শেষ এবং সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ আসমানী ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিধানসমূহ ধর্মীয় আইন বিশারদদের সাহায্যে মানবজাতির সকল প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচনা করে। আধুনিক যুগের সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। যেহেতু আলেমরা সামাজিক জীবনে অংশ নেন, তাই জনগণের প্রতিদিনের সমস্যা ও প্রয়োজনের নিরিখে দিকনির্দেশ ও মতামত দেয়া হয়।

ঐশী উৎস, আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি থাকার কারণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রকৃতি নিঃসন্দেহে অন্য সকল ধরনের সরকার থেকে শ্রেষ্ঠ।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাঠামো ও গঠন প্রকৃতি

ইরানে যেভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে অনুসারে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকার পদ্ধতির সাথে কাঠামো ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের কিছু সাযুজ্য ও কিছু পার্থক্য রয়েছে। আইন, নির্বাহী ও বিচারবিভাগের এখতিয়ারাধীনে দেশটি সংগঠিত। এক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারের সাথে মিল রয়েছে। এ তিনটি বিভাগ ছাড়াও আরো কিছু সংস্থা আছে, যেগুলো ঐ বিভাগত্রয়ের তত্ত্বাবধান করে। এক্ষেত্রেই অন্যান্য সরকারের সাথে পার্থক্য। এ সংস্থাগুলোই ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সাথে অন্যান্য সরকারের প্রধান পার্থক্য নির্ণয় করে। অন্য সংস্থাগুলো হচ্ছে ঃ সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ, সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ এবং নেতৃত্ব বা বেলায়েত-ই ফকিহ্।

সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ

মজলিস, ইসলামী পরামর্শক পরিষদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান এবং ইসলামী বিধান, আইন ও সংবিধান অনুসারে এর কার্যক্রম নিশ্চিত করতে "সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ" নামে একটি পরিষদ রয়েছে। ৬ জন ফকিহ ও ৬ জন

www.pathagar.com

আইনজ্ঞের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত। প্রকৃতপক্ষে এ পরিষদই দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এ কর্তৃপক্ষ ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানে গৃহীত আইনসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবিধানের ৯১তম ধারায় বলা হয়েছে ঃ

পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ যাতে ইসলামী বিধান ও সংবিধানের নীতিমালা লঙ্ঘন না করে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ গঠিত হবে ঃ

১। ইসলামী আইন এবং যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ৬ জন উপযুক্ত আইন বিশারদ। এ ব্যক্তিদের নিয়োগের দায়িত্ব নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদের।

২। আইনের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষিত ৬ জন মুসলমান আইনজীবী। বিচার বিভাগের উচ্চ পরিষদ এদের নাম প্রস্তাব করবে আইন পরিষদে এবং এদের মনোনয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের কাজের মধ্যে রয়েছে ঃ সংবিধানের ব্যাখ্যা, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তত্ত্বাবধান, ইসলামী পরামর্শক পরিষদে সদস্য নির্বাচন তত্ত্বাবধান, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুমোদন। সংবিধানের ৯৬তম ধারায় বলা হয়েছে ঃ

পরিষদে গৃহীত আইন ইসলামী বিধান অনুযায়ী কি-না, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক অভিভাবক পরিষদের আইনজ্ঞরা। অনুরূপভাবে আইন সংবিধান অনুযায়ী কি-না, সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেবেন অভিভাবক পরিষদের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে।

সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ

এ অধ্যায়ে বিপ্লবী আদালতসমূহ সম্পর্কে আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতে ইরানের বিচার ব্যবস্থা ছিল শাহ সরকারের বেআইনী কার্যাবলী অনুমোদনের সরঞ্জাম। ঐসব আদালতে ইসলামী ন্যায়বিচার বা মানবিক সমতার কোন চিহ্ন ছিল না। ঐ ব্যবস্থার প্রশাসকরা ছিল শাহ সরকারের হাতিয়ার। ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য সব কিছুই বিবেচনা করা হত। শাহের বিচার ব্যবস্থায় কোন মুসলমান বা আল্লাহ বিশ্বাসী থাকলে, তারা সবসময়ই ছিল সমর্থনহীন। প্রকৃতপক্ষে শাসক ক্ষমতা তাদের ত্যাগ করেছিল এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে অক্ষম ছিল। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের আগে বিচার ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল ইসলামী চেতনার অভাব। এ ত্রুটি তখনো সংশোধিত হয়নি। পরিস্থিতি অনুধাবন করে সংবিধানে

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এ পরিষদ ইসলামী বিধান অনুসারে বিচার প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের দায়িত্ব পায়। ৫ সদস্যের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত। এদের প্রত্যেকেই হবেন মুজতাহিদ। এদের মধ্যে দু'জন—সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান ও দেশের প্রসিকিউটর জেনারেল—নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ দ্বারা নির্দিষ্ট হন। অপর ৩ জন সদস্য বিচারকদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাই ইরানের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে এবং এ ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচার পরিষদই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ। দেশে ইসলামী বিধান প্রবর্তনে অসম্মত ব্যক্তিদের সৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ বহু লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং ইরানের বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী বিধান রূপায়ণে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সংবিধানের অনুমোদনের সময় থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এ পরিষদের প্রথম কার্যকাল ছিল। আশা করা হয়, এর মধ্যে দেশের বিচার ব্যবস্থা ইসলামী হবে এবং জনগণ ইসলামী বিচার ব্যবস্থার আওতায় পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগীয় নিরাপত্তা অনুভব করবে। এটা উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমান বিশ্বে ইরানের সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের মত কোন প্রতিষ্ঠান নেই। অন্যান্য ইসলামী দেশেও এরকম প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না। কেবল ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের জনগণই এ ধরনের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার সুযোগ ভোগ করে।

বেলায়েত-ই-ফকিহর নেতৃত্ব

বিশ্বের বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক সরকারসমূহের সাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকারের পার্থক্য হচ্ছে ইরানে বিরাজিত নেতৃত্বের ধরনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এ নেতৃত্ব হচ্ছে বেলায়েত-ই-ফকিহ। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সরকারের ধরন উম্মাহ ও ইমামের মধ্যেকার সম্পর্কভিত্তিক। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সংগঠন এবং সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব। এ ব্যবস্থার দুটো ভিত্তি রয়েছেঃ জনগণের ভোট এবং ইসলামী বিধান ও ঐশী আইন। প্রথম ভিত্তিটির অভিভাবক জনগণ নিজেরাই। কারণ জনগণই বিভিন্ন আইন-কানুন বাস্তবায়নে প্রার্থীদের ভোট দেয় এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ও আইনানুসারে দায়িত্ব পালন পর্যালোচনা করে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নির্বাচিত বা ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রথম প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল।

সংবিধানের ১১০ ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের একটি এ্যাক্ট বা ইসলামী পরামর্শক পরিষদের একটি এ্যাক্ট বলে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়।

www.pathagar.com

তবে এটা নেতার অনুমোদন পেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা জনগণের পরোক্ষ ভোটদান। প্রথম প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে ১৩৬০-এর ৩১শে খোরদাদে (১৯৮১'র ২১শে জুনে) নেতার অনুমোদনক্রমে পরিষদের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন হয়।

এ ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি ইসলামী বিধান ও ঐশী আদেশসমূহ বলবৎ-করণ তত্ত্বাবধানে কারো প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের আস্থাভাজন কাউকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সে ব্যক্তিকে ঐশী আদেশসমূহ এবং ইজতিহাদ পর্যন্ত ইসলামের মৌল বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হতে হবে। তৃতীয়তঃ যুগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া ছাড়াও তাঁর মধ্যে থাকতে হবে ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা ও দেশের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। সংবিধানের ৫ম ধারায় এসব বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। তাই নেতা বা বেলায়েত-ই-ফকিহ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি ঐশী আদেশ ও ইসলামী বিধানসমূহের সাথে সরকারী নীতিমালার সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করেন। এভাবে তিনি আল্লাহ ও জনগণের কাছে দায়ী থাকেন।

নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ নির্বাচন পদ্ধতি, তাদের বা তার গুণাবলী, তার বা তাদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পর্কে সংবিধানে বিস্তারিত বলা হয়েছে। নেতৃত্ব পরিষদ নির্বাচন সম্পর্কে সংবিধানের ১০৭ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

যখন কোন ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানী সংবিধানের ৫ম ধারায় উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা মারজায়ি ও নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন, যেমন হয়েছেন বিশিষ্ট মারজায়ি ও বিপ্লবের নেতা মহান আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী। এ নেতার সকল নির্দেশ দানের ক্ষমতা থাকবে। অন্যথায় জনতার নির্বাচিত বিশেষজ্ঞরা নেতৃপদের জন্যে প্রার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবেন। সর্বোত্তম কাউকে পাওয়া গেলে, তাকেই জনতার সামনে নেতা হিসেবে তুলে ধরা হবে। না হলে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন তিন থেকে পাঁচজন উপযুক্ত ধর্মীয় নেতাকে নিয়ে গঠিত হবে নেতৃত্ব পরিষদ এবং তাদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে।

নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ সদস্যদের যেসব যোগ্যতা থাকতে হবে, সংবিধানের ১০৯ ধারায় তার উল্লেখ রয়েছে।

নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ সদস্যদের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১। ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ধর্মীয় আদেশ প্রদানের জন্যে আবশ্যকীয় জ্ঞান ও গুণাবলী।

২। রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি, সাহস, যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত সক্ষমতা।

সংবিধানের ১১০ ধারায় নেতার দায়িত্ব ও এখতিয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১। অভিভাবক পরিষদের আইনজ্ঞদের মনোনয়ন।

২। দেশের সর্বোচ্চ বিচার কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।

৩। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবেঃ

(ক) যুগ্ম স্টাফ প্রধানের নিয়োগ ও বরখাস্ত।

(খ) ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর প্রধান অধিনায়কের নিয়োগ ও বরখাস্ত।

(গ) ৭ সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন। সদস্যারা হবেনঃ

১। প্রেসিডেন্ট

২। প্রধানমন্ত্রী

৩। প্রতিরক্ষামন্ত্রী

৪। যুগ্ম স্টাফ প্রধান

৫। ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক

৬। নেতা নিয়োজিত দু'জন উপদেষ্টা

(ঘ) সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে তিন বাহিনীর জ্যেষ্ঠ অধিনায়কদের নিয়োগ।

(ঙ) সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রস্তাবক্রমে যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা এবং বাহিনী সমাবেশ।

৪। জনগণ কর্তৃক নির্বাচনের পরে প্রেসিডেন্টের পরিচয়পত্র স্বাক্ষর। প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভারকালে বর্তমান আইনে নির্ধারিত যোগ্যতা অনুসারে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা অনুমোদন করবেন নেতা। পরবর্তী নির্বাচনে এ দায়িত্ব থাকবে অভিভাবক পরিষদের।

৫। প্রেসিডেন্ট সরকারী দায়িত্ব লঙঘন করেছেন বলে অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্ত বা রাজনৈতিক অযোগ্যতার জন্যে পরিষদ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার পরে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত।

৬। ইসলামী নীতিমালার কাঠামো ও সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশের পরে শাস্তি প্রাপ্তের দণ্ড ক্ষমা বা দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করা।

যিনি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত এবং ইসলামী ব্যবস্থার বিষয়বস্তুসমূহ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ, তিনিই ফকিহ। নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ অন্য সকল নাগরিকের মতই আইনের চোখে সমান। এছাড়াও উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আথিকভাবে তারা বিচার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। সংবিধানের ১১২ ধারায় বলা হয়েছেঃ

নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদের সদস্যারা অন্যান্য নাগরিকের মত আইনের চোখে সমান।

www.pathagar.com

নিয়োগের পূর্বে ও পরে নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, তাদের স্ত্রী বা স্বামী ও সন্তানদের সম্পত্তি পরীক্ষা করে দেখবে যে, বেআইনীভাবে কোন সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে কি-না।

নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদের কোন সদস্য সরকারী দায়িত্ব পালনে অক্ষম প্রমাণিত হলে বা ১০৯ ধারায় নির্ধারিত কোন যোগ্যতা হারালে ঐ ব্যক্তিকে অপসারণ করা হবে। এ ধরনের অযোগ্য নির্ণয়ের দায়িত্ব ১০৮ ও ১০৯ ধারায় উল্লেখিত বিশেষজ্ঞদের। এ ধারা বিবেচনা ও কার্যকরকরণের জন্যে বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের বিধি বিশেষজ্ঞ পরিষদের প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হবে।

এ ৩টি বিষয় এবং সংবিধানের ১১০ ধারা অনুসারে নেতা বা নেতৃত্ব পরিষদ সদস্যদের ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেলায়েত-ই-ফকিহ'র দায়িত্ব গ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আল্লাহ ও জনগণের কাছে তাদের দায়িত্ব সবচাইতে বেশী। দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনে এ ধরনের ফুকাহার (ফকিহ'র বহুবচন) উপস্থিতি ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থায় এটি অপরিহার্য।

ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে, সেটা কেবল দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত। এখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিকগুলো সম্পর্কে এ সরকার পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গী আলোচিত হবে।

ইসলামী ঐক্য

একটি ইসলামী ব্যবস্থা বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। উপনিবেশবাদীরা সবসময়ই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দিয়েছে। কারণ এ ঐক্য তাদের স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর। তারা ভাল করে জানে যে, বিশ্বের মুসলমানরা এক হলে সকল বৃহৎশক্তির চেয়ে বেশী শক্তি সংগঠিত হবে। তখন মুসলমান জনগণকে শোষণ করা বা আধিপত্যাধীনে রাখা হবে অসম্ভব। তাই নিজেদের প্রচারণা ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাহায্যে উপনিবেশবাদীরা মুসলমানদের, বিশেষতঃ শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। বহু ভাসা-ভাসা "ইসলামী সরকারের" নেতা নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব উপনিবেশবাদীদের এসব সামন্ততান্ত্রিক সংঘাতের অবসান, সারা দুনিয়ায় ইসলামী ঐক,

www.pathagar.com

কায়েমের জন্যে চেষ্টা করে। মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী ঐক্য কায়েম হলে মুসলমানদের একটি প্রকৃত আকাঙ্খা পূরণ হবে, বিশ্বে প্রকৃত ইসলামী শাসন কায়েমের একটি শর্ত হবে পূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানের ১১ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

'তোমাদের এ সম্প্রদায় একটি সম্প্রদায় এবং আমি তোমাদের প্রভু' (২১ ঃ ৯২) কোরানের এ আয়াত অনুসারে সকল মুসলমান এক জাতি এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সরকার স্বীয় রাজনৈতিক নীতিকে ইসলামী দেশসমূহের ঐক্য ও সংহতির এবং ইসলামী দুনিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জনের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করাবে।

এখন পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার এ প্রগতিশীল ও ইসলামী নীতির পথে এগোচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, কেমন অগ্রগতি হচ্ছে, তা এ বইতেই দেখা যাবে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু

ইসলাম সর্বোপরি দয়া ও ক্ষমার ধর্ম। ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার পুরোপুরি বিবেচিত হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম সংখ্যালঘুদের এভাবে রক্ষা করেনি। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানে এ ধারণা তুলে ধরে দু'টি ধারা রয়েছে। প্রথমটি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং দ্বিতীয়টি অ-মুসলমানদের সম্পর্কে। সরকারীভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ১৩ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

ইরানীয় জরোয়াস্ট্রীয়, ইহুদী ও খৃষ্টানরা একমাত্র স্বীকৃত সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা আইনের আওতায় অবাধে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে পারবে। ব্যক্তিগত বিষয় ও ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুসারে কাজ করতে পারবে।

সকল অ-মুসলমান সম্পর্কে আরেকটি ধারা, ১৪ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

কোরানের আয়াত অনুসারে, "তোমার ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেনি, তোমার বসতি থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেনি, তাদের প্রতি তোমার দয়ালু হওয়া উচিত, এবং তাদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ভালবাসেন।" (৬০ ঃ ৮) জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সরকার এবং সকল মুসলমান অ-মুসলমানদের সাথে সহৃদয়তা, ন্যায়বিচার, সমতার আচরণ করতে দায়িত্ববদ্ধ। তাদের মানবাধিকার রক্ষা করা হবে। যারা ইসলাম বা ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না, কেবল তাদের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্তক্ষণ থেকে সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অ-মুসলমানদের সাথে এ আচরণই করা হয়েছে। ইসলামী আদেশ অনুসারেই তাদের অধিকার রক্ষিত হয়েছে। তবে ইসলাম বা ইরানী জাতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের সাথে সহযোগিতা করার দায়ে এদের কাউকে-কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যে সব মুসলমান অপরাধী বিভিন্ন অপরাধ করেছে, তাদেরও দেয়া হয়েছে অনুরূপ শাস্তি। তাই আমরা বলতে চাই, ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি। ইহুদীবাদীরা ও অন্যান্য বিশ্ব নিপীড়ক প্রচারণা চালিয়েছে যে, বিপ্লবোত্তর ইরানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অত্যাচার করা হচ্ছে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইহুদীবাদী ও তাদের সহযোগীদের স্বার্থাবলীর প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই তারা এ বিপ্লব মোকাবিলায় মিথ্যা ও কুৎসার আশ্রয় নিয়েছে। বিপ্লবের আগে আমাদের মত ইরানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও নিপীড়িত হত। বিপ্লবের পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সহ সকল ইরানী স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত মুক্তির স্বাদ পায়। এতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা সন্তুষ্ট। সংবিধান প্রণয়নের জন্যে তারা বিশেষজ্ঞ পরিষদে কয়েকজন সদস্য নির্বাচন করে। এ সদস্যরা পরিষদের কার্যক্রমে কার্যকরভাবে অংশ নেন। বর্তমানে ইসলামী পরামর্শক পরিষদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। তারা নিজেরাই বলেছে যে, নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ইতিপূর্বে তারা এমন স্বাধীনতা পায়নি। নির্বাচনের পরিবেশ কখনও এত অবাধ ও শান্ত ছিল না। ইরানে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত পরিস্থিতি বিদেশে এ সম্পর্কে পরিচালিত প্রচারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ স্বাধীনতা উপনিবেশবাদী ও তাদের দাসদের স্বার্থের সাথে সংগতিহীন। কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ন্যায়ানুগ আইনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জাতীয়তা ও জাতিসমূহের অধিকার

ইসলামে বর্ণ বা গোত্র মৌল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, আল্লাহ্ ভক্তিই মূল বিচার্য। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে ঃ 'সর্বাপেক্ষা ধার্মিকই খোদার কাছে সর্বোত্তম'। ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বর্ণবাদ বা অ-ঐশী প্রভাবের, যেমন বর্ণ, গোত্র, জাতি—যার আরেকটি ব্যাখ্যা জাতীয়তাবাদ—এর কোন স্থান নেই। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, কোন ইসলামী দেশ ভাষা, লেখা বা রীতিনীতির, যতক্ষণ এগুলো ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করে না, কোন স্থান নেই। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধান অনুসারে সরকারী ভাষা হচ্ছে ফারসী। তবে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার আছে। সংবিধানের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

ইরানের জনগণের সাধারণ ভাষা ও বর্ণমালা ফারসী। সকল সরকারী চিঠিপত্র, দলিল, ভাষা, পাঠ্য বইতে এ ভাষা ও লেখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। তবে প্রকাশনা, গণমাধ্যম ও নিজেদের স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় বা ফারসীর সাথে উপজাতীয় ভাষার ব্যবহার অনুমোদনীয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বিভিন্ন জনগণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয়। বর্ণ, গোত্র বা ভাষার ভিত্তিতে কোন সুবিধা বা বৈষম্য নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সমান অধিকার ভোগ করে।

এ ব্যাপারে সংবিধানের ১৯ ও ২০ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

এ জাতির কোন নাগরিক বংশোদ্ভূত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন সুবিধা বা অগ্রাধিকার পাবে না।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, এ জাতির সকল নাগরিক আইনের কাছে সমান বিবেচিত হবে এবং সকল মানবীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ইসলামী বিধানভিত্তিক হবে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধান থেকে দেখা যায়, পবিত্র কোরানের ভাষা আরবী দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষার মর্যাদা পাবে। দেশের সরকারী দিনপঞ্জীর শুরু হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর হিজরত দিয়ে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার। কারণ এই ইসলামী দেশের ইতিহাস ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে সংবিধানের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

যেহেতু কোরানের ভাষা আরবী এবং ইসলামী বিজ্ঞান ও শিক্ষাদানেরও ভাষা আরবী এবং যেহেতু ফারসী ভাষা আরবী ভাষার সাথে পুরোপুরি মিশে আছে, তাই এ ভাষা প্রত্যেক শ্রেণীতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই শেখাতে হবে।

এ দেশের ইতিহাস সরকারীভাবে শুরু হয়েছে ইসলামের নবীর (দঃ) মক্কা ত্যাগের সময় থেকে। সৌর ও চান্দ্র, উভয় দিনপঞ্জীই বৈধ। তবে সরকার সৌর তারিখ ব্যবহার করবে। সরকারী ছুটির দিন শুক্রবার।

উপরে উল্লেখিত বিষয় থেকে দেখা যায় যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদের (দেশপ্রেম) বিরোধী নয়। তবে ইসলাম জাতীয়তাবাদকে অপরিহার্য মনে করে না। ইসলাম মনে করে আল্লাহর বন্দেগীই মৌল বিষয়। দেশের ভেতরে ও বাইরে বিপ্লবের শত্রুদের একটি অপপ্রচার হচ্ছে যে, এ বিপ্লব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। তবে সংবিধান থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ বিপ্লব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নয়, তবে জাতীয়তাবাদের বিরোধী, নিজের বৈধ অস্তিত্বের ভিত্তিই এর কারণ।

www.pathagar.com

নারী অধিকার

সংবিধানের ২০ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, এদেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং মানবীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ইসলামী বিধান ভিত্তিক হবে।

এ ছাড়াও, ২১ ধারায় স্পষ্টভাবে নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

সরকার ইসলামী বিধান অনুসারে নারী অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য এবং নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ দেয় ঃ

১। নারীর চরিত্র বিকাশে এবং তার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক অধিকার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ গঠন।

২। মায়েদের, বিশেষতঃ সন্তানসহ মায়েদের সাহায্য প্রদান, শিশুর যত্ন ও এতিমদের রক্ষা।

৩। পরিবার টিকিয়ে রাখতে উপযুক্ত আদালত গঠন।

৪। বিধবা, বয়স্কা মহিলা ও অভিভাবকহীনাদের জন্যে বিশেষ বীমা চালু করা।

৫। কোন বৈধ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে (ইসলামী আইন অনুসারে) শিশুর কল্যাণে শিশুর অভিভাবকত্ব উপযুক্ত জননীকে প্রদান।

৬। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবে মেয়েরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তারা তা এখনো করছে।

বিশেষজ্ঞ পরিষদে নারীদের একজন প্রতিনিধি ছিল এবং বর্তমানে নারী প্রতিনিধিরা ইসলামী পরামর্শক পরিষদের কাজে অংশ নিচ্ছে। ইরানী মেয়েরা ইসলামের শিক্ষা পুরোপুরি মেনে চলেই বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সামরিক কাজে অংশ নেয়, তারা দেশের উন্নয়নে ও ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীনতা

ইসলামী ব্যবস্থায় জনগণ নিজেদের পেশা ও বাসস্থান পছন্দ, রাজনৈতিক সমাবেশ ও রাজনৈতিক দল গঠন এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে অবাধে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, এগুলো যেন দেশের বা ইসলামের আইন লঙ্ঘন না করে। এ ব্যবস্থায় তদন্ত, নির্যাতন ও সেন্সরশীপ নিষিদ্ধ। ইসলামের আইন লঙ্ঘন না করে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারে সংবাদপত্র। সংবিধানের ২২ ও ২৮ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে ঃ

www.pathagar.com

আইনে অন্যভাবে না বলা হলে জনগণের সম্মান, জীবন, সম্পত্তি, অধিকার, গৃহসংস্থান ও পেশা অলঙ্ঘনীয়।

তদন্ত নিষিদ্ধ। কিছু বিশ্বাসের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

ইসলামের নীতিমালা বা জনগণের অধিকার লঙ্ঘন না করে সংবাদপত্র অবাধে নিজস্ব মতামত তুলে ধরতে পারে। আইনের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে।

আইনের নির্দেশ ছাড়া চিঠি-পত্র খোলা ও আটক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ বা টেলেক্স বার্তা রেকর্ড বা প্রকাশ করা, সেন্সরশীপ, বার্তা প্রচার বা বিতরণে ব্যর্থতা, আঁড়িপাতা বা কোন ধরনের নাশকতামূলক কাজ নিষিদ্ধ।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বা ইললামী বিধান, স্বাধীনতা, মুক্তি, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের নীতিমালার প্রতি বৈরী না হলে জনগণ অবাধে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও পেশাগত দল, সমিতি, ইসলামী সমিতি বা সরকারীভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমিতি গঠন করতে পারবে। এসব গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা অংশ নিতে পারবে অবাধে। এসব গোষ্ঠীতে অংশ করা থেকে বিরত বা অংশ করতে বাধ্য করা যাবে না কাউকে।

ইসলামী নীতিমালার প্রতি ক্ষতিকর না হলে ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ করতে পারবে।

ইসলাম, জনস্বার্থ বা অন্যদের অধিকারের সাথে সঙ্গতিহীন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের পছন্দমাফিক পেশায় নিয়োজিত থাকার অধিকার রয়েছে। চাকরির সম-সুযোগ ও নিজেদের পেশা বেছে নেয়ার সম-সম্ভাবনা দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার জন্যে সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সরকার বাধ্য।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে, এ সব ধারায় প্রদত্ত নিশ্চয়তার চেয়েও বেশী স্বাধীনতা পেয়েছে বিভিন্ন গ্রুপ ও সমিতি। এ স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে এত বেশী ছিল যে, তা অন্যদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা ও ইসলামের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে। অথচ বিশ্ব লুন্ঠনকারীদের প্রচার মাধ্যমগুলো বর্তমান ইরানকে দমন-পীড়নমূলক দেশ হিসেবে বিশ্বের জনগণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। স্বার্থ নষ্ট হয়েছে যাদের, তাদের কাছ থেকে এটাই আশা করা হয়।

বৈদেশিক নীতি

বিপ্লবের সময় ইরানী জনগণের অব্যাহত শ্লোগান ছিল, 'পূর্ব নয়, পশ্চিম নয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র।' এ শ্লোগানই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র নীতির রূপরেখা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বা পশ্চিমের

www.pathagar.com

আধিপত্যের অস্বীকৃতিই ইসলামের পররাষ্ট্র নীতির মৌল নীতি। ইসলামের ইসলামের পররাষ্ট্র নীতিতে অনুরূপভাবে আধিপত্য চাপিয়ে দেয়াও অস্বীকৃত হয়। একটি ইসলামী ব্যবস্থার পররাষ্ট্র নীতির প্রেক্ষিতে বর্তমানে বঞ্চিত দেশসমূহকে সাহায্য করা, সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্যে মুক্তি আন্দোলনসমূহের সাথে সহযোগিতা করা এক ইসলামী দায়িত্ব।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানে, ইসলামী সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হিসেবে, ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হচ্ছে সকল ধরনের আধিপত্য বা আত্মসমর্পণ করাকে অস্বীকার, দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা, সকল মুসলমানের অধিকার রক্ষা, জোটনিরপেক্ষতা, অনাগ্রাসী দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক।

প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সেনাবাহিনী বা ইরানী জাতির অন্য কিছুর ওপরে বিদেশী আধিপত্য বিশিষ্ট কোন চুক্তি সম্পাদন হবে না।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সমগ্র মানব সমাজে মানুষের সমৃদ্ধি কামনা করে, বিশ্বের সকল জনগণের অধিকার হিসেবে স্বাধীনতা, মুক্তি, সত্য ও আইনের শাসন স্বীকার করে। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের সত্যান্বেষী সংগ্রাম সমর্থন করে।

অর্থনৈতিক নীতি

অর্থনৈতিক দিক থেকে বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক, এ দুই শিবিরে বিভক্ত। সমাজতন্ত্রও এক ধরনের পুঁজিবাদ। যদিও সমাজতন্ত্র মানুষের ওপর মানুষের শোষণভিত্তিক নয়, তবে এ ব্যবস্থা সরকার বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কর্তৃক সমগ্র জাতিকে শোষণ করে। তাই, মূলগতভাবে এ দুই ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয় ব্যবস্থাই শোষণ ভিত্তিক।

ইসলামী অর্থনীতি উভয় ব্যবস্থাই অস্বীকার করে এবং একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয়। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। মালিকানার ওপর আরোপিত হয় কিছু সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতা অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরে বাধা দেয়। ইসলামে সকল ধরনের শোষণ নিষিদ্ধ।

অনাবাদী জমি, খনিজ সম্পদ, সমুদ্র, অরণ্য, পার্বত্য এলাকা মুসলমানদের অভিন্ন সম্পদের অংশ। অভাবী ও এসব থেকে সুবিধা সংগ্রহে অক্ষমদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে এ সম্পদ বন্টন করে দেয়া হয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৩টি খাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত: সরকারী, সমবায় ও বেসরকারী।

সংবিধানের ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে:

আইনগতভাবে অর্জিত ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। সংশ্লিষ্ট মাপকাঠি আইন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

সরকারী মালিকানার পক্ষে সরকারী খাত সকল বড় কোম্পানী, মৌল শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৃহৎ খনি, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাঁধ, প্রধান-প্রধান খাল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বেতার ও টেলিভিশন, ডাক ও তার যোগাযোগ, বিমান ও জাহাজ চলাচল, সড়ক ও রেলপথ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

সমবায় খাত শহর ও গ্রামাঞ্চলে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে গঠিত উৎপাদন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তিগত বা বেসরকারী খাত সরকারের অর্থনৈতিক কর্মৎপরতার সম্পূরক কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য ও সার্ভিস বা সেবামূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

এ খাতে মালিকানা এই অধ্যায়ে উল্লেখিত অন্যান্য ধারার সাথে যতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ, ঠিক ততটুকুই দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মালিকানা ইসলামী আইনের সীমানা অতিক্রম করে, সাহায্য করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে, সমাজের কোন ক্ষতি করে না, ততক্ষণ ইসলামী প্রজাতন্ত্রে মালিকানা রক্ষা করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতীয় সম্পত্তি সম্পর্কে সংবিধানের ৪৫ ধারায় বলা হয়েছে:

পতিত জমি, সমুদ্র, হ্রদ, অরণ্য, অনাবাদী জমি, ও পশুচারণ ক্ষেত্রের মত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতীয় সম্পত্তি সরকারী মালিকানাধীন। উত্তরাধীকারহীন সম্পত্তি, মালিকের সন্ধানহীন সম্পত্তি ও দখলদারের কাছ থেকে ফেরত নেয়া সরকারী সম্পত্তি ইসলামী সরকারের মালিকানাধীনে। এ সরকারই জাতির স্বার্থে এগুলো ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণ করবে। এগুলো ব্যবহারের বিস্তারিত রূপরেখা ও নিয়ম সাব্যস্ত হবে আইনের মাধ্যমে।

পূর্ববর্তী ভাড়াটে শাসকবর্গের লুন্ঠিত সমাজের বঞ্চিত জনগণের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে সংবিধানের ৪৯ ধারায় সব ধরনের শোষণ বিলোপ করে বলা হয়েছে:

দখল, উৎকোচ, সরকারী তহবিল তছরূপ, চুরি, জুয়া, ধর্মীয় সম্পত্তি, সরকারী চুক্তি ও লেনদেন, অর্থ আত্মসাৎ, পতিত জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রি, দুর্নীতির কেন্দ্র ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে অর্জিত সকল সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করবে এবং এসব সম্পদ উপযুক্ত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। যেক্ষেত্রে মালিকের পরিচয় জানা যাবে না, সেক্ষেত্রে সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে হস্তান্তরিত হবে।

www.pathagar.com

সরকারের উপযুক্ত যাচাই ও ঐশী আইনের ভিত্তিতে সাক্ষী যাচাইয়ের পরেই কেবল এসব ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

বস্তুবাদী আদর্শ ও ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামে অর্থনীতি কোন উদ্দেশ্য নয়, মাধ্যম। প্রবৃদ্ধি ও বিবর্তনের জন্যে অর্থনীতিকে ব্যবহার করা উচিত। ৪৩ ধারা অনুসারে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকার ইরানের জনগণের প্রধান চাহিদাসমূহ—গৃহ, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিবাহ ও চাকরি—মেটাতে প্রয়োজনীয় মাধ্যম যোগাতে বাধ্য। এটা এমনভাবে করতে হবে, যাতে নিয়োগকারী হিসেবে সরকার বা একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ জমা না হয়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প

মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। যেকোন সমাজের জনগণের বিকাশ ও জ্ঞান ঐ সমাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। ইরান ও অন্যান্য ইসলামী দেশে ইসলাম উৎখাত, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাধীন দেশগুলো থেকে স্থানীয় সংস্কৃতি নির্মূলকরণ এবং তদস্থলে একটি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে বিশ্ব শোষক লুণ্ঠনকারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টা উপরোক্ত সত্যের কারণে হয়েছে আরো দ্রুততর। উপনিবেশবাদীরা জানে যে, কোন দেশকে পরনির্ভরশীল করার প্রথম পন্থা হচ্ছে ঐ দেশটির সাংস্কৃতিক পরিচয় দূর করা। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ধ্বংস হলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক স্বাধীনতাও ধ্বংস হয়। বিগত শতাব্দীতে উপনিবেশবাদীরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাধীন দেশগুলোতে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিগত কাঠামো চাপিয়ে দিয়ে উপনিবেশবাদীদের খাদ্য, বস্ত্র, স্থাপত্য, শিক্ষা কর্মসূচী, শিল্প, এমনকি খেলাও নকল করিয়েছে। ঐ সব দেশকে নিজস্ব প্রকৃতি ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যেই উপনিবেশবাদীরা এমন করে। ঐসব দেশের মূল সংস্কৃতি ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট শূন্যতাকে কাজে লাগিয়েছে উপনিবেশবাদীরা। নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া ও উপনিবেশবাদীদের ওপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্যে উপনিবেশবাদীরা এমন করে।

সংস্কৃতির জন্যে প্রচণ্ড ক্ষতিকর হামলা চালানো হয়েছে যেসব দেশে, ইরান তাদের মধ্যে একটি। এ দেশীয় চরদের সহায়তায় উপনিবেশবাদীরা ইরানে পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার জন্যে ইরানকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করে। এ বলপ্রয়োগের ফলে ঘটে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মূলতঃ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মধ্যে এরকম একটি বিপ্লব নিহিত ছিল। জনগণের দ্বারা বিপুল বুদ্ধিবৃত্তিগত ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তনের ফলে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ঐশী পরিচালনায় জ্ঞান

www.pathagar.com

অর্জনের ভিত্তিতেই ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এর আলোকে ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক নীতি ও শিক্ষা প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তাকে কাজে লাগানোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে মানুষের প্রকৃতি ও আল্লাহর মধ্যে একটি পর্দা টেনে দেয়ার চেষ্টা করে।

মানবীয় সম্পর্ক এমনই হওয়া উচিত যাতে, মানুষ স্বর্গীয় শুদ্ধতার দিকে যেতে পারে। এর ভিত্তিতে বস্তুজগতকে উপলব্ধি করার চেষ্টার পাশাপাশি মুসলমানদের উচিত মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন, মানবীয় চিন্তাকে ত্রুটিহীন করা এবং অন্যদের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্প সৃষ্টিসমূহকে কাজে লাগানো, এসব ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যসমূহ ভাগাভাগি করে নেয়া। বিজ্ঞানের মতই শিল্পকলা ও খেলাধূলাকে মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্যে চর্চা করা উচিত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের সাফল্য যেমন প্রকৃতি মোকাবিলায় সাহায্য করে, অনুরূপভাবে মানুষের শিল্পগত ও দৈহিক সাফল্যসমূহও মানুষেরই বিবর্তন ও পরিশুদ্ধতায় অবদান রাখে। মানুষ যেন এদের সেবার যন্ত্রে পরিণত না হয়।

শিল্প হচ্ছে মানুষের আশা-আকাঙ্খা, আদর্শ, সংগ্রাম, দুঃখ-দুর্দশা ও প্রেমের চমৎকার অভিব্যক্তি। বাজারের পণ্য না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের শিল্পই বিপুল সম্মান পায়। একজন শিল্পীর লুক্কায়িত চিন্তা ও সংবেদন প্রকাশের অকৃত্রিম ভাষাই শিল্প। একজন শিল্পীর সংবেদন ও জটিল মনঃচেতনার ওপর পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিক্রিয়া শিল্পীরই কল্পনার সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রতিফলন ঘটায় শিল্পে।

সকল ধরনের শিল্পই মানুষের প্রয়োজন মেটায়। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সাথে ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ শিল্পই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যময়। ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে এক স্বর্গীয় সমাজ, সত্য, ন্যায়-বিচার ও স্বাধীনতার জন্যে মানুষের সহজাত কামনা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে মানুষের চেষ্টা; পৃথিবীর অশুভ শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মানুষের অব্যাহত সংগ্রামই তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের শীর্ষদেশে বিরাজমান। এখান থেকে উৎসারিত শিল্পই মহত্তম।

লাঞ্ছিত-বঞ্চিতের স্বার্থে নিবেদিত ইরানের ইসলামী বিপ্লব সচেতন-জাগ্রত মানবতার এক মহান শিল্প-সাফল্য। এ থেকে বিকশিত হচ্ছে অন্যান্য শিল্প। বিপ্লবী কবিতা ও গদ্য সাহিত্য, সঙ্গীত ও বীরগাঁথা, বীরত্বের বিপ্লবী মহাকাব্য, বিমূর্ত শিল্প, বিপ্লবী নাটক এবং শিল্পীবৃন্দ এ বিপ্লবেরই উপজাত। এ সবই বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে সক্রিয় এবং এরই পাশাপাশি বিপ্লব দ্বারা নিজেরাই লালিত ও বিকশিত এবং উদ্দীপিত।

আমাদের বিপ্লবী সম্প্রদায় ইসলামী বিপ্লবের শৈল্পিক ও সৃজনী ক্ষমতার প্রশংসা করেন। বিশেষ করে গত বছর এ ক্ষমতা আরো বিকশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা এ সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ও সম্প্রসারণের মাধ্যম প্রস্তুতে দায়বদ্ধ। শিল্প উপস্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে বেতার, টেলিভিশন, নাটক, চলচ্চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী। এগুলোকে প্রকৃত ইসলামী ও বিপ্লবী শিল্পে রূপান্তর করা যায়। একটি ইসলামী সমাজে অভিজাততান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক বা যৌনাত্মক শিল্পের স্থান নেই, স্থান নেই ভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পেরও।

ইসলামী বিপ্লবী সমাজে সকল শিল্পকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটা সহজ কাজ নয়। সারা দুনিয়ার প্রত্যেক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে ইসলামী বিপ্লবের পবিত্র বার্তা পৌঁছে দিতে হবে শিল্পীকে এবং এটা করতে হবে বিভিন্ন মাধ্যমে। ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার জন্যে নিখরচায় শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করতে এবং মেধা বিকাশের ভিত্তিভূমি প্রণয়নে দায়বদ্ধ। সংবিধানের ৩০ ধারায় বলা হয়েছেঃ

সরকার উচ্চবিদ্যালয় থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ববদ্ধ। দেশের স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সাথে সাথে সকল ইচ্ছুক ব্যক্তির উচ্চশিক্ষার সুযোগও করে দিতে হবে।

সামরিক নীতি

ইসলামী সরকার ও মুসলমানদের রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ইসলামে অপরিহার্য। সামরিক বাহিনী গঠন ও অস্ত্রসজ্জিতকরণ সবসময়ই আল্লাহয় বিশ্বাস ও আদর্শগত মাপকাঠির সাথে সম্পর্ক রেখে হওয়া উচিত। একটি ইসলামী ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী শাসন ব্যবস্থা রক্ষা ছাড়াও আল্লাহর পথে জিহাদ করার এবং গোটা দুনিয়ায় আল্লাহর বাণী ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও নেবে। পবিত্র কোরান ইসলামের সেনাবাহিনীকে এ দায়িত্বই দিয়েছে। সূরা ইনফালের ৬০তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এবং আল্লাহ ও তোমার শত্রুদের ভীত করতে জনগণকে সমবেত করার জন্যে প্রস্তুত হও। ইসলামী সেনাবাহিনী বিদেশীদের আধিপত্যাধীন থাকতে পারে না। আল্লাহয় বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু লোকদের সমন্বয়েই এ বাহিনী গঠন করা উচিত। এ বাহিনী অবশ্যই ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ৪৫ ও ৪৬ ধারায় বলা হয়েছেঃ

দেশের সেনাবাহিনীতে বা সংরক্ষিত বাহিনীতে কোন বিদেশীকে গ্রহণ করা হবে না।

দেশের মাটিতে সকল বিদেশী সামরিক স্থাপনা, এমনকি তা' শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে হলেও, নিষিদ্ধ হল।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পরে, ইরানী বাহিনী একদা যে বিদেশীদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হত, সেই সকল বিদেশীকে বরখাস্ত করা হয়, ইরানে আমেরিকার সকল সামরিক ঘাঁটি দেয়া হয় বন্ধ করে। বর্তমানে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের আদর্শগত ভিত্ বিকাশের চেষ্টা করছে, ইসলামী ব্যবস্থা সংরক্ষণে দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।

কার্যাবলী

এ অধ্যায়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিজয়োত্তর কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পরে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে কিছু গৌরবোজ্জ্বল ক্ষণ। প্রতিটি বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এ দু'টি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ঐসব বিপ্লবের চেয়ে ভিন্নতরভাবে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পূর্বে বা পরে কোন বৃহৎ শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। অথচ ঐসব বিপ্লব হয় কোন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে চালিত বা কোন বৃহৎ শক্তি দ্বারা সমর্থিত অথবা বিপ্লবের বিজয়ের পরে কোন না কোন বৃহৎ শক্তির আশ্রিত চরিত্র গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী বিপ্লব সবসময়ই উভয় পরাশক্তি ও তাদের চরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে ও করছে। এ কারণে বিনির্মাণ, এমনকি দেশের পুনর্গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করার মত পর্যাপ্ত সময় বিপ্লবী শক্তিসমূহ পায়নি বললেই চলে। এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চক্রান্ত এবং ইসলামী ও বিপ্লবী ভান করে থাকা বিভ্রান্ত প্রবণতাসমূহের দ্বারা। এ রকম বিপথে চালিত প্রবণতার উদাহরণ বনি সদর। এসব বিপ্লবের অব্যাহত সাফল্যের পথে বাধা।

এসব সত্ত্বেও ধর্মীয় চরিত্র ও গণসমর্থনের কারণে ইরানের ইসলামী বিপ্লব দশ বিনির্মাণে ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্নকরণে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। ইসলামী বিপ্লব যেসব সমস্যার সম্মুখীন্ হয়েছে, সেগুলো পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। বৃহৎ শক্তিবর্গ ও তাদের আভ্যন্তরীণ চরদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট বাধা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিপ্লবসমূহের ইতিহাসে এ বিপ্লব অভূতপূর্ব, নজীরবিহীন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব নিপীড়িত জাতি বিদ্রোহে জেগে উঠতে চায়, ইসলামী বিপ্লব তাদেরকে দিতে পারে অমূল্য অভিজ্ঞতা।

ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ

যেহেতু ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের প্রারম্ভেই ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়, তাই এই সংগঠনের দুর্বলতা ও সবলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

বিপ্লবের বিজয়ের ৩ মাস আগেই ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালের ১১ই জানুয়ারী, ইমাম খোমেনী ইরানী জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক ইশতেহারে এ পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি তখনও প্যারিসে অবস্থান করছেন। এ ঘোষণার একটি অংশে তিনি বলেন ঃ

"উপযুক্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলমান এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এ পরিষদ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ নামে অভিহিত হবে। এ পরিষদ অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করবে। পরিষদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়োগ সাময়িক। এ পরিষদের কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী অধ্যয়ন ও বিবেচনা করা, এ সরকার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করা, বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠনের ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তাবলী অধ্যয়ন করা।"

পাঁচজন জঙ্গী ধর্মীয় নেতা ঃ সর্বজনাব মুতাহারি, বেহেশতি, হাশেমী রফসানজানি, মুসাভি আরদেবিলি ও বাহনুরের সমন্বয়ে এ পরিষদের কেন্দ্র গঠিত হয়। এর অল্পকাল পরেই পরিষদে আরো তিনজন ধর্মীয় নেতাকে নিয়োগ করা হয়। এরা হচ্ছেন সর্বজনাব তালেকানি, খামেনী ও মাহদাবি কানি। পরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আরো ৭ জনকে নিয়োগ করা হয়। এরা অবশ্য ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। এদের অধিকাংশই ছিলেন জাতীয় ফ্রন্টের সদস্য।

বিপ্লবী পরিষদের ৩ মাস স্থায়ী প্রথম পর্যায়ে বিজয় অর্জনে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। পরিষদ সদস্যরা ইরানেই অবস্থান করতেন। প্রকৃতপক্ষে, এঁরা ইমাম খোমেনীকে সরাসরি পরামর্শ দিতেন। ইমাম খোমেনী প্যারিস থেকে প্রত্যাবর্তন করার পরে আরো ৩ জনকে বিপ্লবী পরিষদে যোগ দিতে বলা হয়। এরাও বিদেশে ছিলেন, এরা অবশ্য ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। অস্থায়ী সরকার গঠনের কয়েক দিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। অস্থায়ী সরকার গঠনই ছিল ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা।

এ পর্যায়ে বিপ্লবী পরিষদ আইন বিভাগ এবং অস্থায়ী সরকার নির্বাহী বিভাগ হিসেবে কাজ করছিল। সরকার যে কোন বিল অনুমোদনের জন্যে বিপ্লবী পরিষদে পেশ করতে বাধ্য ছিল। সরকারে মন্ত্রী নিয়োগের জন্যে বিপ্লবী পরিষদ ও পরবর্তীতে ইমামের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। কিন্তু অস্থায়ী সরকার সেভাবে কাজ করেনি। বিপ্লবী পরিষদের সাথে অস্থায়ী সরকার পরামর্শ করত না। এমনকি প্রশাসন, উপ-মন্ত্রী, গভর্ণর জেনারেল বা সেনা অধিনায়কদের নিয়োগের ব্যাপারেও অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী পরিষদের অনুমোদন নিত না। এভাবে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করত। অস্থায়ী সরকারে পদ গ্রহণের জন্যে বিপ্লবী পরিষদের কয়েকজন সদস্য পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

অস্থায়ী সরকার গঠনের পাঁচ মাস পরে বিভিন্ন কমিটি, বিপ্লবী আদালত ও ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর মত বিপ্লবী সংগঠনসমূহ নিয়ে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের সাথে অস্থায়ী সরকারের মতভেদ শুরু হয়। এরই মধ্যে সূচনা হয় বিপ্লবী পরিষদের তৃতীয় পর্যায়ের। বিপ্লবী শক্তিসমূহ ও বিপ্লবী পরিষদের সাথে অস্থায়ী সরকার সদস্যদের চিন্তার সামঞ্জস্যহীনতার কারণে এসব মতভেদসূচক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়। অস্থায়ী সরকারের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জাতীয় ফ্রন্টের সদস্য। বিপ্লবী সংগঠনসমূহ প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়। এসব সংগঠন সরকারী বিভাগগুলোর প্রধানদের সাথেও সংঘাতের দাবী জানায়। বিপ্লবী পরিষদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এসব দাবীর সাথে একমত হন। কিন্তু অস্থায়ী সরকার এসব চিন্তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় না। জাতীয় ফ্রন্টের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই এর কারণ।

অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী সংগঠনসমূহের এসব কাজকে 'ক্ষমতার বহু কেন্দ্র' হিসেবে অভিহিত করে, সরকারের নিজস্ব কার্যক্রম ও কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ঐসব কাজকে মনে করে ঝামেলা। বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বাজারগান বিপ্লবী সংগঠনসমূহ ও বিপ্লবী পরিষদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করে; কার্যত বিপ্লবী সংগঠনসমূহ ও বিপ্লবী পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে সৃষ্টি করে বাধা। এ উভয় সংকট নিরসনে অস্থায়ী সরকার প্রস্তাব দেয় যে, বিপ্লবী পরিষদের পাঁচজন সদস্য মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হিসেবে সরকারে যোগ দিক। এদের মন্ত্রী পরিষদের প্রতি বৈঠকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। অনুরূপভাবে বিপ্লবী পরিষদেও সরকারের পাঁচজন সদস্য যোগ দিক এবং এদেরও ঐ একই ক্ষমতা থাকবে। এ সমাধান প্রস্তাব বিপ্লবী পরিষদে অস্থায়ী সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়, অস্থায়ী সরকারের সমস্যাবলী ও অধক্ষতার মধ্যে বিপ্লবী পরিষদকে জড়িয়ে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে বিপ্লবী পরিষদই হবে দুর্বল।

১৯৭৯ সালের ৬ই নবেম্বর অস্থায়ী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিপ্লবী পরিষদের চতুর্থ পর্যায়। অস্থায়ী সরকারের পতনের প্রধান কারণ তাদের মনোভঙ্গীর সামঞ্জস্যহীনতা। অস্থায়ী সরকার বিপ্লব নয়, সংস্কার চেয়েছিল। এর মূল নিহিত রয়েছে মুক্তিফ্রন্টের মধ্যে। পশ্চিমা ও উদার-নৈতিক মনোভঙ্গীর কারণে মুক্তিফ্রন্ট বিপ্লব চাইত না, চাইত সংস্কার। তাই এ সরকার বিপ্লবী সংগঠনগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারত না। বিপ্লবী সংগঠনসমূহ সমাজ ও বিপ্লবের গভীরে নিহিত ছিল। এ ছাড়াও, পররাষ্ট্র নীতি এবং বিপ্লবী দেশ ও মুক্তিফ্রন্টসমূহের প্রতি মনোভাব ও অবস্থান সম্পর্কে অস্থায়ী সরকার অ-বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে, এমনকি বিপ্লবের নীতির

www.pathagar.com

বিরোধিতাও করে। দায়িত্ব পালনকালে অস্থায়ী সরকার মিসর, ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা করেছিল ইমামের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এবং ইমাম ও বিপ্লবী পরিষদের চাপে। তাই ইরানের জনগণ, বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকরা এ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক এবং তারা এ সমাধানও চান। আমেরিকান সরকারের গোয়েন্দা কেন্দ্র দখল করে ইসলামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা যে বিপ্লবী কাজ করে, সেটাই অস্থায়ী সরকার ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের মধ্যে চিন্তাগত ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য তুলে ধরে, এ ঘটনারই ফলে অস্থায়ী সরকার পদত্যাগ করে।

অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগের পরে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্যে বিপ্লবী পরিষদকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ পর্যায়ে বিপ্লবী পরিষদের আইন ও নির্বাহী ক্ষমতা, উভয়ই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ পর্যায়ে বিপ্লবী পরিষদে অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা, আপোসকামী ও পশ্চিমাপন্থী ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মূল দায়িত্ব পালনে বিপ্লবী পরিষদকে বাধা দেয়। উদাহরণ-স্বরূপ, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে বনি সদরকে বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি হিসেবেও নিয়োগ করা হয়। মুক্তিফ্রন্টের মনোভঙ্গীই হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বনি সদরের থাকতে না পারার মূল কারণ। যেদিন থেকে বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্ব অকার্যকর হয়েছে, সেদিন থেকেই জনগণ সুদৃঢ়, জনপ্রিয়, পাশ্চাত্য-বিরোধী সরকার চেয়েছে। রাজাই মন্ত্রিসভার নিয়োগের মধ্য দিয়ে সে আকাঙ্খা পূরণ হয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রক্রিয়ার সাথে মুক্তি-ফ্রন্টের মনোভাবের সামঞ্জস্যহীনতার ফলে বহু সংঘাত ঘটে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মূল শক্তি হচ্ছে প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী জনগণ, যারা পশ্চিমা বা পূর্বমুখী ঝোঁকের প্রতি বিরক্ত।

সংস্কারবাদী ও পশ্চিমা-ঝোঁকা মনোভাবের মত বিরাট বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবী পরিষদ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রচুর কাজ করে। গঠনকাল থেকে ইসলামী পরামর্শক পরিষদের (মজলিস) কাজ শুরু করা পর্যন্ত (১৫ মাস) সময়ে নয় শতাধিক বিল ও পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের সাথে চুক্তিগুলো বাতিল করা।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্র নীতি রূপায়িত হয়। পাহলভী শাসনকালে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল আমেরিকান অনুচর, ফ্রম্যাসন সদস্য ও সাভাক চরদের আখড়া। তবে কারো অনুচর নয়, এমন কিছু লোকও এখানে ছিল।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারী জাতীয়তাবাদী ও পশ্চিমা উদারনৈতিকরা এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। বিশ্বের জনগণের কাছে বিপ্লবকে উপস্থাপন এবং অন্যান্য দেশের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কের আয়োজন করার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিপ্লব পরবর্তী ২৬ মাস এ মন্ত্রণালয় ছিল এমন চার জন মন্ত্রীর হাতে, যারা হয় জাতীয়তাবাদী অথবা পশ্চিমা উদারনৈতিক। ইসলামী প্রকৃতির একটি বিপ্লবের জন্যে যেসব পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রয়োজন, এই মন্ত্রীরা যে খোদ মন্ত্রণালয়ে বা বিদেশে দূতাবাসসমূহে সে পরিবর্তন ও রূপান্তর করেনি, তা স্বাভাবিক ব্যাপার। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্র নীতি বিদেশে তুলে ধরার মাধ্যমটি শক্তিশালী হতে পারেনি। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের বহু কর্মচারী, রাষ্ট্রদূত, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স এবং বিদেশে ইরানের প্রতিনিধি দফতরসমূহের কর্মচারী বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এ পরিস্থিতি ছিল। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্র নীতি সঠিক ও সময়োচিতভাবে প্রয়োগ করার জন্যে এ মন্ত্রণালয়ে ও বিদেশে দূতাবাসসমূহে শুদ্ধি অভিযান প্রয়োজন ছিল। এটা কিয়দংশে করা হয়েছে, তবে এ শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত রাখা উচিত। বিপ্লবের পরে ও চার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমলে (সানজাবি, কুতুবজাদেহ, বনি সদর, ইয়াজদি) যারা দায়িত্ব পায়, তাদেরকেও এ শুদ্ধি অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তদস্থলে নিয়োগ করতে হবে বিপ্লবের প্রকৃত পথের প্রতি নিবেদিত ব্যক্তিদের।

যদিও ইসলামী বিপ্লবের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের এ মাধ্যমটি বিপ্লবী চেতনার সাথে সমানুপাতিক ছিল না, তথাপি বিপ্লবের গণমুখী শক্তি ও আমাদের নেতৃত্বের বিশেষ প্রভাব অন্য সকল প্রভাবকে অতিক্রম করে বিস্তার লাভ করে এবং সকল শক্তিকে বিপ্লবের পথ অনুসারে গতিশীলতা দান করে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌল ও কার্যকর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণগুলো নীচে সংক্ষেপে উল্লেখিত হল ঃ

১৯৭৯ সালের ২৭শে মার্চ ইরান সেন্টো থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে। এর ফলে ঐ চুক্তির বিলোপ ঘটে।

১৯৭৯ সালের ১লা মে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার মিসরে সাদত সরকারের নিন্দা করে। সাদত সরকার কুদ্‌স দখলকারী সরকারের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল, এর সাথে সম্পাদন করেছিল একটি চুক্তি। মিসরের সাথে সম্পর্ক ইরান ছিন্ন করে।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের ১৩ই মে বিপ্লবী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান অবমাননাকর রাষ্ট্রের এখতিয়ার-মুক্তভাবে বসবাসের অধিকার সম্বলিত চুক্তি বিলোপ করে। এ চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শাহ সম্পাদন করেছিল।

১৯৭৯ সালের ৩রা নবেম্বর বিপ্লবী পরিষদ ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ১৯৫৯ সালে সম্পাদিত উপনিবেশীকরণ চুক্তি বাতিল করে।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা নবেম্বর ইমামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস (গোয়েন্দা আখড়া) দখল করে এবং ইরানী জাতি গুপ্তচরদের জিম্মী করে। এ গুপ্তচররা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল।

১৯৭৯ সালের ১১ই নবেম্বর ইরান জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হয়।

১৯৭৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার মরক্কোর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মরক্কো আমেরিকার অন্যতম অনুচর।

১৯৮০ সালের ১লা জুলাই ইরানের রুশ দূতাবাসের প্রথম সচিবকে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৮০ সালের ১৫ই জুলাই "গোয়েন্দা" জিম্মীদের নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার বারংবার হুমকির পরে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ইরান আনুষ্ঠানিক-ভাবে ছিন্ন করে।

১৯৮০ সালের ১৬ই আগষ্ট লেনিনগ্রাদে ইরানী কন্স্যুলেট বন্ধ করে দেয়ার পরে ইরান সরকার ইস্পাহান ও রাস্ত-এর কন্স্যুলেট দু'টি বন্ধ করে দিতে বলে রাশিয়াকে। এভাবে রাস্তে রুশ কন্স্যুলেট বন্ধ হয়।

১৯৮০ সালের ১৬ই আগষ্ট ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার ঘোষণা করে যে, ইহুদীদের কাছে আত্মসমর্পণকারী ও জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তরকারী সকল দেশের সাথে ইরান সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

১৯৮১ সালের ১৯শে আগষ্ট ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার চিলি সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এ ছাড়াও, ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনসমূহ, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনগুলো, যেমন ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা, রুশ আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগানিস্তানের ইসলামী আন্দোলনসমূহ, দক্ষিণ ফিলিপাইনের মোরো মুক্তিফ্রন্ট, ফাতানি মুক্তিফ্রন্ট, এবং পূর্ব বা পশ্চিমা-ঘেঁষা শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুসলমান মুজাহিদদের কার্যকর সাহায্য দেয়। ইরান সরকার ইরানে এসব আন্দোলনের প্রতিনিধিদের অধীনে এমন বহু ব্যবস্থা দিয়েছে, যেগুলো তাদের সংগ্রামকে সাহায্য করেছে। ইরানে ইসলামী

www.pathagar.com

বিপ্লব বিজয়ের প্রথম দিনগুলোতে কুদ্‌স দখলকারী ইহুদী সরকারের তেহরানস্থ প্রতিনিধির দফতরটি বিপ্লবী শক্তিসমূহ পিএলও প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করে।

ইহুদী দখলদার ও পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেবাননী ও আফগান ভাইদের বিপুল আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েছে ইরানী সরকার ও জনগণ।

দখলদার, আগ্রাসী ও আশ্রিত সরকারগুলোর সামনে গ্যাস ও তেল ক্ষেত্রে ইরানী ইসলামী বিপ্লবের কার্যকলাপ ছিল খুবই চমকপ্রদ। অতীতে শাহ সরকারের সাথে সকল আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বসিয়ে দেয়া সরকারগুলোর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। নিপীড়িত জাতিসমূহের বিরুদ্ধে শাহ সরকার এসব আগ্রাসী ও অন্যের বসিয়ে দেয়া সরকারের সাথে সহযোগিতা করত। এসব সরকারের মধ্যে রয়েছে কুদ্‌স দখলকারী সরকার, ফিলিপাইনে বসিয়ে দেয়া সরকার, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার এবং দুই পরাশক্তি—আমেরিকা ও রাশিয়া। বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান সরকার এসব সরকারের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করে এবং ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, আমেরিকার কাছে তেল ও রাশিয়ার কাছে প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রি বন্ধ করে দেয়। রাশিয়া গ্যাসের ন্যায্যমূল্য দিতে গররাজী ছিল।

"পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়" নীতির ভিত্তিতে ইরান সরকার সকল বৈদেশিক আধিপত্য অস্বীকার করেছে, একই নীতির অনুসারী দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও ঐসব দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং নিপীড়িত-বঞ্চিত জাতিসমূহকে সাহায্য করেছে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের কার্যাবলী

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে আমরা অলৌকিক কিছু খুঁজলে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের কার্যাবলীর ধরনের মধ্যেই তা খুঁজে পাব। আর ইরানের ইসলামী বিপ্লবই ত' চলতি শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা। তবে এ বিপ্লবের কার্যাবলী আরো অলৌকিক ব্যাপার। বিপ্লবোত্তর ইরান ছিল এমনই এক বাড়ী, যে বাড়ীর দ্বার ছিল সবার জন্যে খোলা। অস্থায়ী সরকারের নিজস্ব নীতি ছিল। এরই বিপরীত দিকে বিদ্রোহী জনতারও ছিল আরেকটি নীতি। প্রতিবিপ্লবীরা নিজেদের ইচ্ছামত কথা বলতে ও কাজ করতে পারত। বিপ্লবের প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী আদালত, কমিটি ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের দৃঢ় ভূমিকা মেনে নিতেই কেবল অনিচ্ছুক ছিল না, এমনকি আমীর ইন্তেজামের (অস্থায়ী সরকারের মুখপাত্র, আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাগিরির জন্যে তার বিচার ও কারাদণ্ড হয়) মত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী, পাহলভী সরকারের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি, বিদেশী পদলেহী ও গুপ্তচরদের পলায়ন প্রতিহত করেনি। প্রকৃতপক্ষে অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রিত শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের কাজে বিঘ্ন ঘটাত, এমনকি বিপ্লবী পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থায় বাধা দিত।

বনি সদর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। সে প্রতি বিপ্লবীদের কাতারে শামিল হয়, এ বিপ্লবের ইসলামী প্রকৃতিতে ভিন্নমত পোষণ-কারী সকলকে সুযোগ দেয়। এমনকি বিপ্লবের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা উৎখাত করতে নিজেদের সকল শক্তি ব্যবহারের জন্যে যারা ইসলামী সরকারের বদলে অনৈসলামী সরকার চাইত এবং যারা ইরানে পরাশক্তিসমূহের প্রত্যাবর্তন দাবী করত, বনি সদর তাদেরকে সুযোগ দেয়। এমতাবস্থায়, বিপ্লবের বৈদেশিক শত্রুরা, বিশেষতঃ আমেরিকা এই অশুভ আনুগত্য এবং বনি সদরের লেখনী ও কথাবার্তার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত চালায়। তার কথিত বিভিন্ন অভিযোগ ব্যবহার করে এবং প্রচারণা যন্ত্রের সাহায্যে সেসব ছড়িয়ে আমেরিকানরা বিপ্লবের দুর্নাম করার চেষ্টা করে।

এরকম পরিবেশে পূর্ব বা পশ্চিমের সাথে গাঁটছড়া বাধা উপদলগুলো প্রেসিডেন্টকে সমর্থন, এমনকি বনি সদর ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে জনগণকে রক্ষার অজুহাতে গোটা ইরান জুড়ে উত্তেজনা ছড়ানো, তাদের কাছে মাথা নত করতে জনগণকে বাধ্য করার জন্যে কুর্দিস্তানসহ ইরানের অন্যান্য অংশে নিরুপায় জনগণের ওপর হামলা চালায়, জনগণ এতে অস্বীকার করলে তারা জনগণকে হত্যা করত এবং দাবী জানাত যে, তারা জনগণের অধিকারসমূহ "রক্ষা" করছে। এ বিশৃংখলা অবসানে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আদালতসমূহ দৃঢ়তা প্রদর্শন করলে এসব উপদলের প্রভুরা সারা দুনিয়ায় বলে বেড়ায় যে, ইরানে কোন স্বাধীনতা নেই। ইহুদীবাদী ও বিশ্ব নিপীড়করা এসব ভাড়াটে দল সংশ্লিষ্ট কোন একটি সামান্য ঘটনাকে শতগুণ বাড়িয়ে দুনিয়ার লোকের কাছে প্রচার করত। অথচ বিপ্লব ও বিপ্লবের নেতার সমর্থনে লক্ষ-নিযুত জনতার মিছিলের কোন উল্লেখ হত না। এ পরিস্থিতি চলতে থাকে।

বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবের মত না হয়ে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সংগঠকরা বিপ্লবের বিজয়ের মাত্র ৪৭ দিন পরে একটি নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে গণভোটের আয়োজন করেন। অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিপ্লবের সংগঠকরা একটি বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে বছরের পর বছর, দেশ চালায়। তারা একটি নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রণয়নে জনতার ভোট গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে না। এ ছাড়া

www.pathagar.com

বিপ্লবের বিজয়ের ১৭০ দিন পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধান প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ পরিষদে সদস্য নির্বাচনের জন্যে তারা আরেকবার ভোট গ্রহণের আয়োজন করেন। চার মাস পরে তারা নয়া সংবিধান সমগ্র জাতির সামনে পেশ করে এ ব্যাপারেও ভোট গ্রহণের আয়োজন করেন। এরপর হয় প্রেসিডেন্ট ও ইসলামী পরামর্শক পরিষদের নির্বাচন এবং এসবের মধ্য দিয়েই ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটির পর একটি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চক্রান্ত সত্ত্বেও বিপ্লবের বিজয়ের দেড় বছরের মধ্যে দু'টি গণভোট (রাজতান্ত্রিক শাসন বিলোপ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি এবং আরেকটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধান প্রশ্নে) এবং চারটি নির্বাচন (বিশেষজ্ঞ পরিষদ, পরামর্শক পরিষদ, প্রেসিডেন্ট এবং পরামর্শক পরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন) সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দেড় বছর পরে বিপ্লবী পরিষদ বিলোপ করা হয় এবং দেশ পরিচালনার ভার গণ-নির্বাচিত সদস্যদের ওপর অর্পণ করা হয়। বর্তমানে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান ইসলামী পরামর্শক পরিষদ ও পরিষদের অনুমোদিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথমবার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ও দ্বিতীয়বার পরোক্ষ ভোটে এ সরকার নির্বাচিত হয়। নেতা ও রাষ্ট্রীয় বিচারকরা সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ নির্বাচন করেন।

বর্তমানে ইসলামী পরামর্শক পরিষদ ২১৬ জন সদস্যের সমবায়ে[১] গঠিত। এদের মধ্যে ৯৮ জন (৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ) ধর্মীয় নেতা। আইন প্রণয়ন যাদের পেশা নয়, তাদের সংখ্যা এ পরিষদে ১১৮ জন। এর মধ্যে ১৬ জন চিকিৎসক, ১১ জন গণিতবিদ, ৪২ জন ভৌত ও সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতক। পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ৬৯ জনের জন্ম গ্রামের পরিবারে। ১৯ জন শ্রমজীবী পরিবার, ৫১ জন ব্যবসায়ী পরিবার, ৬৯ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পরিবার থেকে আগত। অবশিষ্টদের বাবারা চিকিৎসক, শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারী ছিলেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ-সদস্যদের মধ্যে কিছু মুজতাহিদও আছে।

সংবিধানিক বিষয়ের আলোকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নীতির ভিত্তি হচ্ছে বাক ও চিন্তা, রাজনৈতিক দল ও সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, ইসলামের মৌল নীতিমালা ও অন্যদের স্বাধীনতা যাতে লঙ্ঘিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তবে ইসলামী বিপ্লব বিজয়োত্তর

১। মোট ২৭০ জন সদস্য নির্বাচন করার কথা। এটা প্রথম পর্যায়ের পরিষদ নির্বাচনে হয়। তবে যুদ্ধের কারণে কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন হতে পারেনি। এখন অধিকাংশ এলাকায় নির্বাচন হয়েছে। পরিষদ সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে খুব বেশী হেরফের হয়নি।

www.pathagar.com

আড়াই বছর পর্যন্ত সমাজে এ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। এ সুযোগে বহু ব্যক্তি, উপদল ও দল সংবাদপত্রের বা সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করেছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার ভিত্তি ভণ্ডুল হতে পারে, এমন ক্ষেত্রে ছাড়া সরকারের প্রশাসকরা বিধি-নিষেধ আরোপ করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামী পরামর্শক পরিষদে কোন সুনির্দিষ্ট আইন গৃহীত হয়নি। ভবিষ্যতে ইসলামী পরামর্শক পরিষদ স্বাধীনতার পরিধি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী

এ বইতে আগেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপনিবেশ অব্যাহত রাখা, ইরানসহ ইসলামী দেশসমূহে অবস্থান তৈরী করার জন্যে ঔপনিবেশিকদের কাছে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত উপায় ছিল ইসলামী সংস্কৃতির বিকৃতি ও সমাজে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক প্রচার। পশ্চিমা সংস্কৃতি পারিবারিক পর্যায়ে যতটুকু প্রবেশ করেছে, তারা চেয়ে বেশী প্রবেশ করেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। নিজেদের গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ইরানী জনগণ পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করবে না। সুবিধাভোগীরা ও এ সংস্কৃতির উদ্যোক্তারাই "পশ্চিমা" নামের পাঁকে নিমগ্ন হত, তারা হত পুরোপুরি বিকৃত। জাতির নির্ধারক গরিষ্ঠ অংশ যারা, সেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত "পশ্চিমা" পাঁকে নিমগ্নদের জীবন।

পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণে অস্বীকৃতি নির্ধারক গরিষ্ঠ অংশের কারণেই ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে তাদের উপস্থিতি ছিল অতি সামান্য। দেশের বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের কিছু অধ্যাপক ছিল। কিন্তু তারা শাহকে অব্যাহতভাবে সমালোচনা করত বলে তাদেরকে বারবার কারাবন্দী বা চাকরিচ্যুত করা হত। এমনকি ঐ সব কেন্দ্রে থাকতে দেয়া হলেও তাদেরকে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার প্রধান পদগুলোতে আসীন হতে বাধা দেয়া হত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলোতে মূল কর্তারা ছিল সাভাক, ফ্রিম্যাসন বা পরাশক্তিবর্গের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চর। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। কারণ যেসব বিষয় শেখানো হত সেগুলো পাশ্চাত্য থেকেই আমদানী করা। ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রসমূহে পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে পাহলভী সরকারের অনুগতদের বৃত্তি দিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হত। নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ ও যাদুঘরের শিল্পকলার কেন্দ্রগুলো ছিল প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের অনুগতদের নিয়ন্ত্রণে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশৃংখল জীবন-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যম ছিল এগুলো। এ বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষ যন্ত্রমাত্র এবং ইন্দ্রিয় সুখ, যৌনাচার, নৈরাজ্য ছাড়া

www.pathagar.com

তার জন্যে কোন কর্তব্য নেই। পাহলভী আমলে শিল্পে মানবীয় শিল্প ছাড়া সবকিছুই ছিল, শিল্পকে নামানো হয়েছিল নিম্নতম স্তরে।

ইসলামী বিপ্লবের পরে পশ্চিমা-ঘেঁষা বহু অধ্যাপক ও পশ্চিমাদের তাড়া করা সেবাদাসকে চাকরিচ্যুত করা হয়, কমিয়ে ফেলা হয় বৃত্তি, স্থূলতা থেকে শিল্পকে রক্ষা করা হয়। তবে তখনও ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলো পাশ্চাত্যের অমানবিক সংস্কৃতি বিকাশ ও হস্তান্তরের মাধ্যম ছিল। এ ছাড়া অস্থায়ী সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যাবলীর প্রতি খুব সামান্য দৃষ্টি দেয়ায় এসব কেন্দ্র ক্রমান্বয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুসারী রাজনৈতিক উপদলগুলোর দফতরে পরিণত হয়। এমনকি এসব উপদল নিজেদের রাজনৈতিক ইশতেহার ছাপানোর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মুদ্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করত। বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রসমূহের কক্ষগুলোতে অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও যোগাযোগের সামগ্রী রাখার গুদামে পরিণত করা হয়। এসব কেন্দ্র থেকেই আমেরিকা ও অন্যান্য পরাশক্তির নির্দেশে কুর্দিস্তানসহ দেশের অন্যান্য অংশে বিদ্রোহ পরিচালনা করা হত।

এ পরিস্থিতিতেই ইসলামী বিপ্লবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলমান ছাত্ররা মনে করল যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব রক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দেয়া উচিত। এ ছাত্ররাই ছিল দেশের ছাত্র সমাজের নির্ধারক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তারা মনে করল, ইসলামী সংস্কৃতি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনার পরেই অধ্যয়ন চালানো উত্তমতর। ১৯৮০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিপ্লবী পরিষদে পেশকৃত এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলো বন্ধ রাখার আদেশ দেয়া হয়। এসব কেন্দ্র খালি করার সময় ঐ উপদলগুলো সেখানে মজুদ অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরোধ করে। ফলে জনগণ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। কয়েকজন হতাহত হওয়া সত্ত্বেও জনগণ পরাশক্তিবর্গের এই চরদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করতে সমর্থ হয়। এ চররা চেয়েছিল ইরানের সংস্কৃতি পরনির্ভরশীল হয়ে থাকুক।

ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার জন্যে বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী ১৯৮০ সালের জুন মাসে একটি বোর্ড নিয়োগ করেন। বিপ্লবের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্য অর্জনে বোর্ড বিপ্লবের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছাত্র-শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিপুল প্রচেষ্টা চালায়। ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহের লক্ষ্য হবে নির্ভরশীল ও অক্ষম মানসিকতার বদলে প্রশস্ত মনের ও অঙ্গীকারবদ্ধ মুসলমান চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী তৈরী করা, যারা জনগণের সেবা করবে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে অতিক্রান্ত সময়ের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এ ব্যবস্থা ছাত্রদের চালিত করেছে ইসলামী

www.pathagar.com

ও সংস্কৃতির দিকে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে উপনিবেশবাদীদের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর চিন্তাগুলো বর্জন করা হয়েছে। সঠিক ও উপযোগী তথ্যের ভিত্তিতে নয়া বই মুদ্রিত হয়েছে। এখন পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী শিক্ষা ও বিপ্লবী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত। আরো শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে বিপুল চেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে বিপ্লবোত্তর প্রথম দু'বছরে নির্মিত স্কুলের সংখ্যা ইরানের সমগ্র শিক্ষা ইতিহাসে স্থাপিত স্কুলের দু-তৃতীয়াংশের সমান হয়। আমাদের গ্রামের ভাইদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ স্কুল নির্মিত হয়।

পুস্তক ও পত্রিকা লেখা, প্রকাশনা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিপ্লবের পর থেকে এ যাবৎকাল ইরান উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে ইরানে ১৮৪টি নয়া প্রকাশনা মুদ্রিত হয়। এর মধ্যে ১০৫টিই মুদ্রিত হয়েছে তেহরানে! এর মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারী সংস্থার বুলেটিন বা প্রকাশনা ধরা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিপ্লবী ও আদর্শগত বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। অনুরূপভাবে বেড়েছে পাঠক, বিশেষ করে যুব পাঠকের সংখ্যা। বিপ্লবী ও আদর্শগত বিষয় শিক্ষাদানের ক্লাসের সংখ্যা শহরাঞ্চল, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পুনর্গঠন ক্রুসেড নামের সংগঠন প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা জানা যাবে। সামগ্রিকভাবে এসব ব্যবস্থা ও আন্দোলন ইরানী জনগণ, বিশেষতঃ যুবকদের মানসিক বিকাশ, আদর্শগত ও রাজনৈতিক অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর সহায়তা দিয়েছে। এসব নতুন ঘটনা ও বিকাশ বিপ্লবের পূর্বে ইরান ত্যাগ করে এখন ইরানে প্রত্যাবর্তনকারীদেব অবাক করে দেয়।

তেহরানে আমেরিকান "গোয়েন্দা আখড়া" দখল

আপাতদৃষ্টে তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস দখলের ঘটনাকে রাজনৈতিক সমস্যা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি বিপ্লবের রাজনৈতিক দিকের তুলনায় সাংস্কৃতিক দিকের সাথেই অধিক সম্পর্কিত ছিল। গুপ্তচরদের এ আখড়া যারা দখল করেছিলেন, তারা সবাই-ই ছিলেন ছাত্র। যদিও এ ধরনের কাজ স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনে, তথাপি এটা দখলের পেছনে তাদের কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে চুক্তি বা সমঝোতা তাদের ছিল না। বার বার এ কথাটি বলা হয়েছে এবং বাস্তবেও প্রদর্শিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যাবর্তন এবং ইরানে আমেরিকান ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের আশংকাই ইসলামী বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত এই

www.pathagar.com

ছাত্রদের দূতাবাস দখলের পেছনে কাজ করেছে। ছাত্ররা দেখে যে, বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য প্রভাবিতরা, যেমন টেকনোক্র্যাটরা বলতে থাকে যে, তারাই একমাত্র ব্যক্তি, যারা প্রশাসনের কায়দা-কৌশল জানে। যেহেতু এ টেকনোক্র্যাটরা দেশ শাসন করছিল। তাই তারা সে সুযোগে পাশ্চাত্যের দিকে ঝোঁকে। কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজজিনস্কির সাথে করমর্দন করে এবং তার সাথে বন্ধুত্বের মুচকি হাসি বিনিময়ের পরে ইরানের দ্বার আবার পশ্চিমা সংস্কৃতির জন্যে খুলে দেয়। নিজেদের রক্ত দিয়ে বিপ্লব সফল করেছে যে লাখো-লাখো মানুষ, এ পরিস্থিতিতে তাদের ত্যাগের প্রতি প্রদর্শন করা হয় অবহেলা। এমনভাবে সবকিছু সাজানো হয়, যাতে বিপ্লবের লক্ষ্যের ব্যাপারে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবের নেতার কোন ভূমিকা না থাকে।

যে পরিস্থিতিতে ইমামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা আমেরিকা সরকারের গোয়েন্দা আখড়া দখল করতে বাধ্য হয়, সে পরিস্থিতিটির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। সে পরিস্থিতি হচ্ছে ঃ আমেরিকা সরকার তার ভূখণ্ডে শাহকে থাকতে দেয়, শাহকে দেয় রাজনৈতিক আশ্রয়। শাহকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত এনে আমেরিকান অপরাধী নীতির চর হিসেবে ইরানের মাটিতে শাহের বিচার করাই ছিল ছাত্রদের প্রধানতম লক্ষ্য।

ইমামের পথে মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা মনে করে ইরানে আমেরিকান দূতাবাসই ইরানে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক নীতি প্রসারের মাধ্যম। তারা জানত, প্রকৃতপক্ষে দূতাবাসটি "গোয়েন্দাদের আখড়া", ইরানে আবার আমেরিকাকে ক্ষমতাসীন করার পরিকল্পনাকারীদের সাথে এখান থেকেই যোগাযোগ করা হচ্ছে। ফলে ইরানের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ৪ঠা নভেম্বর (ছাত্র দিবসে) তারা দখল করে এই গোয়েন্দাদের আখড়া। এ দখলের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কল্পকাহিনী খান-খান্ করে ভেঙ্গে দেয়। ইরান ও বিশ্বের জনগণের মনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কে এ কল্পকাহিনী ভালভাবেই আসন গেড়েছিল। এ কারণেই এ লেখক এ ঘটনার সাংস্কৃতিক দিকটি পর্যাপ্তভাবে তুলে ধরতে পারেন না।

বিশ্বের জনগণ, বিশেষ করে ইরানীরা, যারা আমেরিকান শক্তির তাসের দুর্গে বিশ্বাস করত, দূতাবাস দখলের মধ্য দিয়ে তাদের সে বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের জনগণের মনে সরাসরি এ

---

* অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাজারগান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইব্রাহিম ইয়াজদি ১৯৭৯ সালের নবেম্বরে আলজেরিয়া সফরে যায় এবং ব্রেজজিনস্কির সাথে সাক্ষাৎ করে।

www.pathagar.com

ধরনের ধারণা জন্মেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ধারণাটি ইরানী সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়। ছাত্ররা যখন গুপ্তচরদের আস্তানাটি দখল করল, তারপরই ধারণাটি উবে যায়। এ কারণেই. বিপ্লবের সদা সচেতন নেতা ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনীকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করার পরে তিনি বলেছিলেনঃ "এ কাজের মধ্য দিয়ে ইরানে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিপ্লব। এ বিপ্লব প্রথমটির চেয়েও বৃহত্তম, মহত্তর।"

এ বিপ্লবী কর্ম সম্পাদনকারী ছাত্রদের সমর্থনে ও রক্ষায় প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতায় ইমাম খোমেনী চারটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি বাক্যই অর্থবহ। প্রতিটি বাক্যই ইরানের ওপর আমেরিকান সরকারের চাপিয়ে দেয়া ও বর্তমানে উপনিবেশ গুলোতে চাপানো ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ভিত্তির একেকটি অংশকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে। প্রতিটি বাক্যই নিজেদের সংস্কৃতি ও প্রকৃতিমূলে সক্ষম করে তুলতে জাতিসমূহের মধ্যে পুনরুদ্যোম জাগাতে নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এ ঐতিহাসিক বাক্যগুলো হচ্ছেঃ

আমেরিকা বৃহত্তম শয়তান।

আমেরিকা দুর্নীতিবাজ।

আমেরিকা অন্তঃসারশূন্য।

আমেরিকা অভিশাপ দিতে পারে না।

১৯৭৯'র নভেম্বরের পর থেকে এ চারটি পংক্তি ইরানী জনগণের নিত্যদিনের ভাষায় পরিণত হয়েছে। এ পংক্তি চারটি ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় বড়-বড় ও সুন্দরতম হরফে লেখা রয়েছে।

তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস দখলের সময়ে ইরানী সংস্কৃতির অংশবিশেষ অতি দ্রুত পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে সরে আসে। তবে পাশ্চাত্যের জনগণ বা তাদের বৈজ্ঞানিক সাফল্যসমূহ ত্যাগ করেনি। ইরানী জনগণ পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। কেননা ইসলামী ও গণসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিকরা এ পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারটি আবারো দেখিয়ে দেয় যে, আমেরিকান গোয়েন্দা আস্তানা দখলের ঘটনাটি যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশী সাংস্কৃতিক ঘটনা।

আমেরিকান দূতাবাসকে "তেহরানে আমেরিকান গোয়েন্দা আখড়া" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ সেখানে কেন্দ্রীভূত ছিল এক ব্যাপক গোয়েন্দা ব্যবস্থা। "সংবাদ" আদান-প্রদানের সর্বাধুনিক যন্ত্র সেখানে ছিল। কার্যতঃ এ সরঞ্জামটি ছিল সিআই, মোসাদ ও কেজিবি'র মত সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিমা প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপদলগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব ছিল দূতাবাস কর্মচারীদের ওপর। তারা ইসলামী বিপ্লবের ঘটনা-প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে সে তথ্য পাঠাত

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে। ছাত্ররা দূতাবাসের ভেতর থেকে প্রচুর গোপন দলিল উদ্ধার করে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা দলিলগুলোও পাওয়া যায়। দূতাবাস বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায়, তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসটি তা ছিল না। দূতাবাস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের সাথেও এর কোন মিল ছিল না।

ছাত্রদের উদ্ধারকৃত দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায়, এ দূতাবাসটি কেবল ইরানী জনগণের বিরুদ্ধেই নয়, এ অঞ্চলের সকল দেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তির কেন্দ্র ছিল। গোয়েন্দা আখড়া দখলের ঘটনা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী বলে প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা ব্যবস্থা অনেক সত্যই লুকিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইরানী জাতি ও বিশ্বের সকল সচেতন জনগণের কাছে দূতাবাস দখল আন্তর্জাতিক বিধির লঙ্ঘন। কিন্তু গোয়েন্দা আস্তানা দখল, তা' হতে পারে না।

কেবল আমেরিকান দূতাবাস থেকেই গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালিত হয় না। বাস্তবে অধিকাংশ দূতাবাস গোয়েন্দাদের আস্তানা এবং এগুলো এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন লঙ্ঘন করে। যেহেতু আমেরিকা ইসলামী বিপ্লব এবং এ এলাকার সকল দেশের প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ হুমকি সৃষ্টি করে, তাই ইমামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। যেহেতু অন্যান্য দূতাবাস এরকম প্রত্যক্ষ ও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করেনি, তাই ছাত্ররা ঐসব দূতাবাসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি এবং ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

আমেরিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ব্যক্ত সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইরানী জনগণ বুঝেছে যে, গোয়েন্দা আস্তানা দখল করা আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিরোধী এবং ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে খোদ ইসলামী বিপ্লবই আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিরোধী। পরাশক্তিবর্গ এ উভয় ঘটনার নিন্দা করেছে, কারণ উভয় কাজই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ইরানী ছাত্ররা যে ধরনের ব্যবহার পেয়েছে, তার সাথে ছাত্রদের হাতে জিম্মীদের ব্যবহারের তুলনা করা যায়। পাশ্চাত্যে যেসব ইরানী ছাত্র আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সরকারের অমানবিক বাড়াবাড়ির কথা বলতে চেয়েছে, সে ছাত্রদের ওপর ঐসব সরকারের পুলিশ বাহিনী চালিয়েছে অত্যাচার, কাউকে-কাউকে অত্যাচার চালিয়ে মৃত্যুর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তাই পাঠকের কাছে আমাদের প্রশ্ন, কোন্‌টি অধিকতর অমানবিক কাজ ঃ একটি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, যে ভবনের বাসিন্দারা, সে ভবনটি দখল করা নাকি সাম্রাজ্যবাদীদের অমানবিক বাড়াবাড়িকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছিল যে ছাত্ররা, তাদের ওপর অত্যাচার ও তাদেরকে হত্যা করা ?

www.pathagar.com

তেহরানে আমেরিকান গোয়েন্দা আখড়া দখলের বহু সুবিধা ছিল। পুরো ব্যাপারটির বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি গোটা বই লেখা যায়। আমরা কয়েকটি সুবিধা উল্লেখ করব ঃ

১। পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় প্রকাশ এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা।

২। পূর্বকে সমর্থনের মুখোশে যারা প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান সরকারের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সেই সব ব্যক্তি বা উপদলের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ।

৩। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের উপনিবেশ-বিরোধী, বিশেষতঃ আমেরিকা বিরোধী দিকটি সুদৃঢ়করণ এবং আমেরিকা-বিরোধী সংঘাত অব্যাহত রাখা।

৪। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে গোপন যোগাযোগ, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতার তথ্য প্রকাশ এবং "পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়," এ বিপ্লবী শ্লোগান আরো দৃঢ়ভাবে অনুসরণ।

৫। আমেরিকান সরকারের চরদের সহায়তা নিয়ে যেসব চক্রান্ত ও অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা গোয়েন্দা আস্তানায় করা হয়েছিল, সেগুলো নিষ্ক্রিয়করণ। গোয়েন্দা আস্তানা থেকে কুদীস্তানে অসন্তোষ সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করা হয়।

৬। সিআইএ'র পদলেহীদের পরিচয় প্রকাশ এবং ইরানে ও এ অঞ্চলে সি আই এ'র গোয়েন্দা জাল ফাঁস হওয়া।

৭। এ অঞ্চলে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকান সরকারের উদ্ধত ও সহিংস কার্যকলাপের তথ্য প্রকাশ এবং বিশ্বের জনগণের মনে এর শক্তিমত্তা সম্পর্কে যে মিথ্যা ধারণা দিয়েছিল, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া।

৮। বিশ্বাসঘাতক শাহ ও তার সহযোগীদের বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া সম্পদ উদ্ধার। (উল্লেখ্য, আমেরিকান গোয়েন্দাদের ছেড়ে দেয়ার আগেই শাহ মিসরে মারা যায়।)

অর্থনীতি ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী

পাহলভী শাসন আমল, বিশেষতঃ ঐ আমলে ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, এমনকি বিদেশে পণ্য রফতানীর সম্ভাবনা থাকলেও ইরানকে পরনির্ভরশীল করাই ছিল ঐ সরকারের লক্ষ্য। পাহলভী শাসনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তাই ইরানের বিপ্লবী শক্তি এমন এক দেশ পায়, যা শিল্প, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরনির্ভরশীল ছিল। স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সম্ভাবনাময় একটি দেশের সে সম্ভাবনা বছরের পর বছর যাবৎ ধ্বংস করা হলে, ঐ সম্ভাবনা অর্জনে কয়েক বছর

www.pathagar.com

লাগে। পাহলভী শাসকগোষ্ঠীর ফেলে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি ও পশু সম্পদ এবং এ সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে জনগণের কার্যক্ষমতা।

বিপ্লবের অগ্রগতির পথে ইসলামী বিপ্লবের বৈদেশিক শত্রু ও আভ্যন্তরীণ চরদের সৃষ্ট সকল বাধা সত্ত্বেও ইরানের বিপ্লবী জনগণের সংগ্রাম ও তাদের অভূতপূর্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জিত হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পরবর্তী কয়েকটি বছরে সাফল্যের পরিমাণ উৎসাহব্যঞ্জক ও আশাতিরিক্ত। বিপ্লবের ওপর পরাশক্তিবর্গ ও তাদের ভাড়াটে চরদের আঘাত ও ঐ সব সমস্যা সত্ত্বেও এ বিপ্লবের চিরাচরিত দৃঢ়ভাবে অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে স্বীয় মহান দায়িত্ব পালন শুরু করে এবং মূল পথ থেকে সামান্যও বিচ্যুত হয়নি। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, ১৯৭৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর থেকে আমেরিকা, তৎপরে ইউরোপীয় সরকারগুলো এবং ১৯৮০ সালের ১৪ই মে থেকে পুঁজিবাদী শিবিরের সাথে সম্পর্কিত দেশসমূহের আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয় ইরান। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে এ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। তবে ইরানের জনগণের ইচ্ছাশক্তি গুড়িয়ে দেয়ার এ চেষ্টা সত্ত্বেও ইরানী জনগণ অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। এ অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরানের জনগণ স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং তারা বহু ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ঘটায়। এ অর্থনৈতিক অবরোধের সময়ই শুরু হয় ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ। তাই দেখা দেয় কিছু বাড়তি সমস্যা। এর ফলে বিপ্লবেব পুনর্গঠন হয়ে পড়ে ধীর।

বিপ্লবের বিজয়ের পরে কয়েক বছরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সাফল্যসমূহের সংক্ষেপ নীচে দেয়া হল। এ ব্যাপারে সবকিছু বিস্তারিত তুলে ধরার জন্যে প্রয়োজন আরেকটি বই লেখা। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে, তা হচ্ছে, এ পর্যন্ত উন্নয়ন, অর্থনীতি ও সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে ইরানের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা বিরূপ পরিস্থিতিতে। শাহের আমলে প্রতিদিন ৬০ লাখ ব্যারেল তেল বিক্রি করা হত। কিন্তু বিপ্লবী সরকার তেল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তা কমিয়ে আনে দৈনিক ৩৫ লাখ ব্যারেলে। তেল বিক্রির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দৈনিক ২৫ লাখ ব্যারেলে আনা হয়েছে। বর্তমানে তেল থেকে উপার্জিত অর্থের পরিমাণ বিপ্লব-পূর্ব পর্যায়ের এক-তৃতীয়াংশ। এর ফলে দেশের তেল মজুদের সময় বেড়েছে আরো ৪০ বছর। এটা বিপ্লবের এক বিরাট সাফল্য।

দেশের তেল থেকে অর্জিত অর্থের পরিমাণ যখন বিপ্লব-পূর্ব সময়ের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ, অর্থনীতি ক্ষেত্রে সে সময়ই ঘটেছে বিপ্লবের স্মরণযোগ্য সাফল্য।

www.pathagar.com

দেশকে বিদেশী নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করার জন্যে বিপ্লবের পূর্বে কোন চেষ্টা চালানো হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তেল বিক্রি থেকে অর্জিত প্রতিটি রিয়াল বিশ্ব নিপীড়কদের ওপর দেশকে নির্ভরশীল করার জন্যে ব্যয় করা হত, এ নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যয়িত হত দেশের তহবিল।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব যদি বিশ্বের জনগণের কাছে কোন বার্তা পৌঁছে থাকে, তাহলে সে বার্তা হচ্ছে ঃ বিপ্লবী নেতাদের প্রদর্শিত সেবার ইচ্ছা ও প্রেম এবং জনগণের নিষ্ঠা ও ত্যাগ। এ জনগণ ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে অসম্ভবকে সম্ভব করে, সকল অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন করে অতিক্রম।

ইরানী জাতীয় তেল কোম্পানী থেকে ৬ শতাধিক বিদেশী কারিগর বরখাস্ত করা হয়। উৎপাদনে সামান্যতম বিলম্ব না ঘটিয়ে বরখাস্তকৃত বিদেশী কারিগরদের সকল কাজ সম্পন্ন করে ইরানী কারিগররা।

কনসোর্টিয়ামের কাছে তেল বিক্রির চুক্তি খারিজ করে ইরান তেল উৎপাদন ও বিক্রি সরাসরি শুরু করে। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে অনুমোদিত অথচ কখনও বলবৎ হয়নি যে, তেল জাতীয়করণ বিল, তা বিপ্লবের বিজয়ের পরে বলবৎ করা হয়। বর্তমানে তেল অনুসন্ধান, আহরণ, উৎপাদন, শোধন ও বিক্রির সব কাজই ইরানীদের নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের বিপ্লবী পরিষদের এক ডিক্রি অনুসারে পারস্য উপসাগরের ইরানী পানি সীমায় তেল আহরণের জন্যে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে বিপ্লব-পূর্ব সকল চুক্তি বাতিল করা হয়।

বিদেশী কারিগরদের বরখাস্ত করার সময় ইস্পাহানে তেল শোধনাগারটি আংশিক সম্পন্ন হয়েছিল। ইরানী বিশেষজ্ঞরা এটির নির্মাণ কাজ শেষ করে। প্রতিদিন ১ লাখ ১০ হাজার ব্যারেল উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীতে এতে উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৭৯ সালে ইরানী উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকরা শিল্পগত ক্ষেত্রে এক শতাধিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন পেশ করে। ১৯৮০'তে এ সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াইশ'।

বিপ্লব বিজয়ের দু'বছর অতিক্রম না হতেই, ১৯৭৯ সালে ৪ হাজার ৭শ' ৬১টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এ সংখ্যা ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত মোট গ্রামের চেয়ে বেশী। ঐ ২০ বছরে ৪ হাজার ৫শ' ৪৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল।

বিপ্লবের বিজয়োত্তর দু'বছরে ৮ লাখ ৪০ হাজার কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নির্মিতি হয়েছে বিপুলসংখ্যক বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা ও কূপ। নলের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ২ হাজার ৯শ' ২৬টি গ্রামে সম্প্রসারিত হয়েছে। (প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাবে পুনর্গঠন ক্রুসেড সংগঠনের কাজের ছকে।)

www.pathagar.com

বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে ২৯ হাজার ৮শ' ৩৪ কিলোমিটার গ্রামের রাস্তা এবং ৭ হাজার ৪শ' ৮২ কিলোমিটার মূল ও পার্শ্ব সড়ক নির্মিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিপ্লব-পূর্ব ও বিপ্লবোত্তর অগ্রগতির মধ্যে তুলনা করার জন্য বিপ্লবের পূর্ববর্তী ১৮ মাসে ও বিপ্লবের পরবর্তী ১৮ মাসে যথাক্রমে শাহ ও পুনর্গঠন ক্রুসেডের নির্মিত গ্রামীণ পথের সংখ্যা উল্লেখই সর্বোত্তম। শাহ সরকার নির্মাণ করেছিল মাত্র ৪ হাজার ৩শ' ৮ কিলোমিটার রাস্তা, পরিবর্তে পুনর্গঠন ক্রুসেড ১৯৭৯ সালের জুন থেকে ১৯৮০'র ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্মাণ করে ১৩ হাজার ২শ' ৯ কিলোমিটার রাস্তা। এ প্রেক্ষিতে উভয় ক্ষেত্রেই সময় ও পরিস্থিতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিপ্লব-পূর্ব যে ১৮ মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা হচ্ছে, ১৯৭৬ ও ৭৭ সালে। অর্থাৎ এ সময়কে "গড়" বলে অভিহিত করা যায়। সে সময়ে দেশে কোন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছিল না। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে পাওয়া যেত সব সুবিধা ও ব্যবস্থা। পুনর্গঠন ক্রুসেডের ১৮ মাসে দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে কুর্দীস্তানের রাজনৈতিক উপদলগুলোর তৎপরতা চলে। আলোচিত সময়ের কিয়দংশে ঘটেছে ইরানের উপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ। এ তুলনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাহলভী সরকারের প্রশাসকরা কিভাবে দেশের অর্থ অপচয় করত, গ্রামবাসীদের রাখত পশ্চাদপদ করে। এটা আরো দেখায়, গ্রামবাসী ও অনান্য বঞ্চিত জনগণের কল্যাণে ইসলামী বিপ্লব কিভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ কাজে লাগায়।

পাহলভী শাসনামলে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল হাতে গোণা কয়েক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে। আমদানীকৃত পণ্যের ৯০ শতাংশ সরবরাহ করত আমেরিকা, জাপান, এবং ইউরোপীয় দেশসমূহ। এসব দেশের বিলাস দ্রব্যের চমৎকার বাজার ছিল ইরান। বিপ্লবের পরে ইরানের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সংশোধন করা হয়। কেবল অপরিহার্য পণ্য আমদানীই ছিল এ সংশোধিত নীতির লক্ষ্য। এ নীতি অনুসারে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী বন্ধ করে দেয়া হয়। যতটুকু সম্ভব অ-উপনিবেশবাদী ও বন্ধু দেশগুলো থেকে আমদানী করা হত। মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনাও ছিল সংশোধিত বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির লক্ষ্য। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সংবিধানের ৪৫ ধারা বাস্তবায়নের জন্যে সরকার ইসলামী পরামর্শক পরিষদে বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ বিল পেশ করে। এ বিল অনুমোদিত হলে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন হবে।

১৯৮১'র শেষ নাগাদ দেশের টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে ১১৯টি গ্রামকে সংযুক্ত করা হয়। সারা দেশে প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার টেলিফোন বসানো হয়। অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অবরোধ ইরানের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। ইরানী বিশেষজ্ঞদের বিশেষ

www.pathagar.com

চেষ্টা ও ধৈর্যের ফলে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জনগণ ও দেশের অর্থনীতির মূল্যবান সেবা সম্পাদিত হয়। অতীতে যেসব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ফেলে দেয়া হয়েছিল, সেগুলোও মেরামত ও সংস্কার করা হয়।

বিপ্লবের বিজয়ের প্রথম দুই বছরে গোটা ইরানে ১ লাখ ৯১ হাজার ৬শ' ৬৫টি আবাসিক ইউনিট নির্মাণ করা হয়। অভাবীদের জন্যে নির্মিত এসব আবাসিক ইউনিটের অধিকাংশই গ্রাম ও নগরে নির্মিত হয়।

১৯৮১তে তুলা আবাদের জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭০% বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের দেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ৫০%।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের লাখ-লাখ হেক্টর আবাদী জমি বিপ্লবের আগে আবাদ করা হত না। বিপ্লবের পরে এগুলো কৃষকদের কাছে দেয়া হয়। যদিও দেশের চারটি উর্বর অঞ্চল যুদ্ধ এলাকায় অবস্থিত, তথাপি পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় দেশের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। খাদ্যশস্যের দিক থেকে ইরান শিগগিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

সামরিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী কার্যাবলী

এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখিত হয়েছে যে, পাহলভী শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই ইরানের সেনাবাহিনীকে পরাশক্তিবর্গ, বিশেষতঃ আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা করেছে। এ কাজে তারা অনেকাংশে সফল হয়। বিদেশী সামরিক উপদেষ্টারা, বিশেষতঃ আমেরিকান সামরিক এ্যাটাসীদেরকেই ইরানী সেনাবাহিনীর প্রকৃত শাসক বলে মনে করা হত। প্রকৃতপক্ষে, একজন আমেরিকান নন্-কমিশণ্ড অফিসার পদস্থ ইরানী সেনা অফিসারদের থেকেও ওপরের অবস্থানে ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল বহু বৈষম্য। এটা মানবিক, ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালার বিরোধী। ইরানে ছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর অসংখ্য ঘাঁটি, প্রকৃতপক্ষে, ইরানী সেনাবাহিনী এ অঞ্চলে আমেরিকান স্বার্থের সেবায় নিয়োজিত ছিল এবং এ জন্যে আমেরিকাকে কোন অর্থ ব্যয় করতে হত না। মুসলমানদের দমন ও ফিলিস্তিন দখলকারী সরকারকে সাহায্যের জন্যে ইরানী সেনাবাহিনী, ইরানের ভূ-খণ্ড ও এ দেশের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো হত।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে ইরান থেকে সকল আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা বহিষ্কার করা হয়; সকল আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে; সেনাবাহিনীতে খাদ্য, চিকিৎসা সুবিধা, অবসর ভাতা ও ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত সকল বৈষম্য দূর করা হয়। এখন অধিনায়ক থেকে সাধারণ জওয়ান পর্যন্ত সকলে একই সুযোগ-সুবিধা পায়।

www.pathagar.com

ইরানের সামরিক স্বয়ম্ভরতা ও সেনাবাহিনীর ইসলামীকরণের লক্ষ্যে এসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এগুলোর প্রভাবও হয়েছে অত্যন্ত কার্যকর। একটি রাজনৈতিক আদর্শগত বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ইসলামী সেনাবাহিনী গঠনে ব্যাপক চেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে সামরিক ব্যক্তিরা সামরিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ইসলামের মানবতাবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এ অমূল্য প্রচেষ্টার ইতিবাচক ফল ফলেছে। সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামী চেতনা এবং এটা ইসলামী আদর্শ প্রসারের পটভূমি হিসেবে কাজ করছে। সেনাবাহিনীতে মক্তব (আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে চিন্তাধারা ; অর্থাৎ, ইসলামী চিন্তাধারা) প্রথা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সাফল্য ইরানে ইরাকী হামলা মোকাবিলায় সৈনিকদের আচরণের মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। এ যুদ্ধে ইরাকী বাথপন্থী সরকারের সেনাবাহিনী ইরানী নগরগুলোর ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায় ; বিমান থেকে বোমা বর্ষণ ও ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে নিরপরাধ নারী-শিশু-পুরুষের হত্যাযজ্ঞ করে। এ হামলা থেকে মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতাল-গুলোও রেহাই পায়নি। ইরানী সেনাবাহিনী কখনোই এমন প্রতিশোধমূলক পন্থা নেয়নি। ইরাকী নগরগুলো ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের গোলাবর্ষণের পাল্লার মধ্যে থাকলেও ইরাকী বেসামরিক লোকদের উদ্দেশে একটি গুলীও বর্ষিত হয়নি। ঐসব নগরে ইরান কোন হামলা চালায়নি। ইরানী সামরিক বিমানগুলো বাগদাদসহ ইরাকী অন্যান্য নগরের ওপরে বারবার প্যাম্পলেট ফেলেছে। সামরিক স্থাপনা, অর্থনৈতিক ও শিল্প এলাকাতেই ইরানী বাহিনী আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে। ইরানী বাহিনী একবারও ধর্মীয় বা সামাজিক কেন্দ্র অথবা আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়নি। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার মধ্যস্থিত ইসলামী নৈতিকতার কারনেই এমন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়েছে। এটা সমাজের প্রতিটি দিকেরও প্রতিফলন। ইসলামী বিপ্লবের পরে যদি সেনাবাহিনীতে এ পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন পরিবর্তন না হত, তাহলেও সেটা হত ইরানী জাতির জন্যে বিপুল গর্বের ব্যাপার।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিপ্লবের বিজয়ের পরে, পূর্ব ও পশ্চিমা জগতের সাথে সম্পর্কিত উপদলগুলো ইরানী সেনাবাহিনী বিলোপ করে সে জায়গায় একটি পুরোপুরি নতুন সামরিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করে। তারা যুক্তি দেখায় যে, পাহলভী শাসন, বিশেষতঃ বিপ্লবের বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে সেনা অধিনায়কদের আচরণের কারণে গোটা বাহিনীকে বাদ দিতে হবে। তারা বলে, জনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান সেনাবাহিনী বিলোপ করা উচিত।

বিপ্লবের নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, সেনাবাহিনী বিলোপ করার স্লোগান ইসলামী বিপ্লবের প্রতি হুমকি এবং এর ফলে কেবল পরাশক্তিদের চররাই লাভবান হবে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইরানী বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিশেষতঃ

www.pathagar.com

ননকমিশণ্ড অফিসার ও বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা জওয়ানরা হয় ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে ছিল অথবা এর বিরোধিতা করত না। এদের অধিকাংশই পাহলভী শাসনের প্রতি এবং সে সময়ে সেনাবাহিনীতে বিরাজিত দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে পাহলভী সরকার জাতির বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ করেছে, সেগুলো পাহলভী সরকার ও তার প্রভু আমেরিকান সরকারের সহযোগিতার ফসল। এর দায়িত্ব গোটা সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ নন্-কমিশণ্ড ও নিম্নপদের অফিসারদের ওপর চাপানো উচিত নয়। এরা হয় ইসলামী বিপ্লবের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিল অথবা দেশের মধ্যেকার চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ইসলামী বিপ্লবের প্রতি ছিল উদাসীন। বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে এরা বিপ্লবী জনতার কাতারে শামিল হয়। ১৯৭৮ এর আশুরায় লাভিজান ঘটনা এবং ইমাম খোমেনীর নির্দেশমত, বিপ্লবের বিজয়ের পূর্ববর্তী কয়েক মাসে সেনাবাহিনীর ত্যাগের ঘটনার মধ্যেই এটা মূর্ত হয়েছে। সেনা-অধিনায়কদের পুরোপুরি হতাশাই হচ্ছে ঐ সরকারের (পাহলভী) প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্যহীনতার এবং জনগণের ইসলামী বিপ্লবের প্রতি সমর্থনের সহজাত প্রবণতার সর্বোত্তম প্রমাণ। এ বিষয়টির সাথে সাথে ইমাম খোমেনী আরো উপলব্ধি করেন যে, নিরস্ত্র ইরান বৃহৎ শক্তিবর্গের আক্রমণের পথ খুলে দেবে। এ উপলব্ধির পরেই তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। এভাবেই তিনি সেনাবাহিনী বিলোপ করার আহবান ভণ্ডুল করে দেন। ইমামের পরিচালনাধীনে সেনাবাহিনী ক্রমান্বয়ে নৈতিক বল ফিরে পায়, মক্তবী (ইসলামী) হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে, যেমন ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবের সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম খোমেনীর গৃহীত অবস্থানের কারণে সেনাবাহিনীকে অদক্ষ বাহিনী থেকে প্রকৃত বাহিনীতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম নির্মাণ ও রক্ষণা-বেক্ষণ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী স্বয়ম্ভরতা অর্জনের দিকে এগোচ্ছে।

ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের দেড় বছর পরে প্রতিদিন একশ' সাব-মেশিনগান তৈরী করা হত। এখন এ সংখ্যা দৈনিক ৩শ'টি ইউনিটে পৌঁছেছে। দৈনিক ৫শ'টি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের ব্যাটারী প্রস্তুত কারখানায় ১৯৭৯ সালে দৈনিক প্রায় এক হাজার ব্যাটারী তৈরী হত। এখন এ পরিমাণ ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ পরিসংখ্যান বিপ্লবের বিজয়ের দেড় বছর পরে, ৯৯৮০'র প্রথমার্ধে ও ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের আগের। বিপ্লবের বিজয়ের আড়াই বছর ও যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় এক বছর পরে অস্ত্র উৎপাদন, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের হার ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বেশী দূরে নয়।

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র

যদি কোন বিপ্লব প্রকৃত বিপ্লবই হয়, তাহলে অগ্রগতি অর্জনের পথে সে বিপ্লবকে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে ইরানের ইসলামী বিপ্লব কোন ব্যতিক্রম নয়। এ বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র এবং 'পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়' নীতির কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের এবং ইসলাম ও মানবতার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে এ বিপ্লবের পক্ষে নির্বিঘ্নে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব ছিল না। এক বৃহৎ শক্তির ওপর নির্ভর করে অন্য বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অন্যান্য বিপ্লবকে যদি এগোনোর পথে সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, তাহলে ইরানের ইসলামী বিপ্লব যে আরো বাধার সম্মুখীন হবে, সেটা স্বাভাবিক। এ বিপ্লবের ইসলামী চরিত্রের কারণেই প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের বিশ্ব নিপীড়ক ও আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম করা এবং আগ্রাসী আধিপত্যকামী নয়, এমন সরকার-গুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

সংস্কার নয়, বিপ্লব

ইরানে যা ঘটেছে, তা বিপ্লব না হয়ে সংস্কার হলে এ ধরনের আন্দোলন কোন বাধার সম্মুখীন না হয়েই এগোতে পারত। তবে বিশ্ব নিপীড়কদের স্বার্থের বিরোধী যে কোন পরিবর্তনই বিপ্লব, সংস্কার নয়। ইরানে যা ঘটেছে, তা প্রকৃত অর্থেই বিপ্লব; এ বিপ্লব বিশ্বে অদ্বিতীয়, সাম্প্রতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এর সাথে পয়গম্বরদের আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছুর তুলনা চলে না, এ কথা গর্বের সাথে বলা যায়। বিরাজিত নিপীড়ক ব্যবস্থা ভেঙ্গে ঐশী বিধানভিত্তিক নয়া ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেমন পয়গম্বরদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, অনুরূপভাবে ইরানের এ বিপ্লব বর্তমান বিশ্বে বিরাজিত মানবতা-বিরোধী মূল্যবোধ ধ্বংস করে ঐশী মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সংঘটিত হয়। স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের ঘটনাকে "সংস্কার" আখ্যায়িত করা যায় না। এটা পয়গম্বরদের আন্দোলনের পরে মানব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গভীর বিপ্লব।

ইরানের অনেক রাজনৈতিক উপদল, এমনকি পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী অনেক দলই সংস্কার ভিন্ন কিছুর চিন্তা করেনি। যেহেতু ইরান বিপ্লবের নেতৃত্ব ইমাম খোমেনী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ওপর এবং তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অনুসারী, তাই এ আন্দোলন সংস্কার হতে পারে না, গভীর ও বহুমুখী বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় সংস্কারবাদী উপদল ইরানের মুক্তি আন্দোলনের ওপর। এ উপদল পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বেশ সংগ্রাম করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব সংস্কারের দিকে ঝুঁকছিল। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইমাম খোমেনী দু'টি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছিলেন। একটি হচ্ছে, দেশ পরিচালনায় দেশের জঙ্গী মুসলমানদের শরিকানা দেয়া। অপরটি হচ্ছে এসব উপদলকে ইরানী জনতার বিপ্লবী চেতনার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং এ ধরনের বিরাট বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে তাদের ধারণাগুলো পাল্টানোর সুযোগ দান। ইমাম খোমেনী ভেবেছিলেন, এসব মুসলমান শক্তি সকল অমানবিক ও অনৈসলামী মূল্যবোধ উচ্ছেদে নিজেদের প্রস্তুতি, উৎসাহ ও গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে, তখন ক্রমান্বয়ে হয়ত এরা নিজেদের অবস্থান পাল্টে গ্রহণ করবে বিপ্লবী জাতির অবস্থান এবং সংস্কারের চেয়ে ব্যাপকতর কিছু চিন্তা করবে।

এসব উপদল কেবল ইরানী বিপ্লবী জনতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতেই ব্যর্থ হয় না, উপরন্তু অনুসরণ করে এমন এক পথ, যা ইরানে ইসলামী বিপ্লবকে ব্যর্থ করবে, এ বিপ্লবকে নিয়ে ফেলবে বিশ্ব নিপীড়ক, বিশেষতঃ আমেরিকার কব্জায়। অস্থায়ী সরকারের আমলে মেহদী বাজারগানকে যখন জানানো হয় যে, বিপ্লবী মুসলমান ইরানী যুবকরা "আমেরিকা মুর্দাবাদ" শ্লোগান দিয়েছে, তখন সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, 'আমেরিকা আমাদের দেশ ছেড়ে গেছে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে আমেরিকা বিরক্ত হতে পারে।" ৭০ হাজার শহীদ ও ১ লাখ মানুষ আহত হয়েছে যে বিপ্লবে এবং এ ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল যে আমেরিকা, সে বিপ্লবের পরে গঠিত সরকারের একজন প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সম্পর্কে এ রকম দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে। ২৫ বছর ধরে আমেরিকা যে দেশ লুট করেছে, ঐ অস্থায়ী সরকার শহীদ ও আহতদের সে দেশটিই এভাবে শাসন করতে চেয়েছিল। অস্থায়ী সরকার যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক সংগ্রামের বিরোধী ছিল, অনুরূপ-ভাবে বিরোধী ছিল ইরানে ব্যাপক বহুমুখী পরিবর্তনের। বিপ্লবী জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে এ সরকার ঝামেলা ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। অস্থায়ী সরকারের লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতিবাজ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং ধীরে-ধীরে দেশকে এমনভাবে চালানো যাতে বিশ্ব নিপীড়ক ও তাদের আভ্যন্তরীণ চরদের স্বার্থের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানোর অধিকার দেশ সেবায় সম্পূর্ণ নিবেদিত বিপ্লবী শক্তিসমূহের ছিল, এ কথাটি অস্থায়ী সরকার স্বীকার করতে চাইত না।

ইরানের বিপ্লবী মুসলমান জনগণ সঠিকভাবেই মনে করে যে, আমেরিকা সরকার ও অন্যান্য বিশ্ব নিপীড়ক তাদের লুট করেছে, পূর্বতন সরকারের

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থার কারণে তারা হয়েছে নিঃস্ব। এ জনগণ এরকম অস্থায়ী সরকারকে দীর্ঘদিন ধরে মেনে নিতে পারে না, তারা পারে না ঐ সরকারের সংস্কারবাদী মনোভঙ্গীর সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে। এ কারণেই, অস্থায়ী সরকারের ৯ মাস শাসনের পরে এবং প্রধানমন্ত্রী বাজারগান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ইব্রাহিম ইয়াজদি আলজিয়ার্সে কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজজিনস্কির সাথে সলা-পরামর্শ করার পরে ইরানের মুসলমান জাতি দেখল যে, তারা আর এ সরকারকে সহ্য করতে পারে না। তেহরানে আমেরিকান "গোয়েন্দা আস্তানা" ছাত্ররা দখল করার পরে বাজারগানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, ইমাম খোমেনী এ পদত্যাগ গ্রহণ করেন।

অস্থায়ী সরকারের অধীনে বিপ্লবের প্রতি আমেরিকা সরকারের মনোভঙ্গী বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। আমেরিকাসহ অন্যান্য বিশ্ব নিপীড়ক এ বিপ্লব সম্পর্কে সহনশীল অবস্থান গ্রহণ করে; তারা আশা করেছিল, ইরানে আমেরিকার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

অস্থায়ী সরকারকে বাতিল এবং ইমামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীদের বিপ্লবী কাজের পরে ইরান সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব পাল্টে যায়।

এর পর থেকেই ঘটতে থাকে ইসলামী বিপ্লবের পরে আমেরিকা সরকারের বড় বড় চক্রান্ত। বনি সদরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে (১৯৮০'র জুন থেকে ১৯৮১'র জুন) বিপ্লবকে দুর্বল করা ও এ বিপ্লবকে সংস্কারের পর্যায়ে রাখার জন্যে আমেরিকা ইসলামী বিপ্লবের প্রতি বৈরীতা অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে আমেরিকা সরকার হতাশ হয়ে পড়লে শুরু করে আরো কঠোর ব্যবস্থা। এ নৈরাশ্যের একটি ফল হচ্ছে বনি সদরকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক সপ্তাহ পরে ১৯৮১'র ২৮শে জুন ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দলের সদর দফতরে বোমা বর্ষণ।

ইরানী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যাপক ষড়যন্ত্র থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের গৃহীত অবস্থানকে বিপ্লবী হিসেবে অভিহিত করা যায়। বিপ্লবের বিজয়ের পরে নিছক সংস্কারবাদী কর্মসূচী নেয়া হলে ইরানের জনগণকে এরকম ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হত না। সংস্কার কর্মসূচী নয়, বিপ্লবই বিশ্ব নিপীড়কদের স্বার্থ বিঘ্নিত করে। এসব বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে সচেতন হয়েই ইরানের জনগণ নিজেদের বিপ্লব অব্যাহত রাখার পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও তারা বুঝেছেন যে এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে। নিপীড়ন প্রতিরোধকারী যে জনগণ ঐশী ও মানবীয় মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবনে সংগ্রামে ভীত হয় না, তারা-ই জয়ী হয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

যারা বলে 'আল্লাহ আমাদের প্রভু' ও অতঃপর সঠিক পথে চলে। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ফেরেশতারা এবং বলে 'ভয় পেয়ো না, দুঃখিত হয়োনা; বেহেশতের বার্তা লও, এজন্যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।' (কোরান, ৪১ ঃ ৩০)

www.pathagar.com

ইরানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপনের চক্রান্ত

পাহলভী শাসনের শেষ মাসগুলোতে আমেরিকান রাজনৈতিক দূতরা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতাদের বলত যে, শাহ উৎখাত হলে ইরান খণ্ড-বিখণ্ড হবে। ইরানে শেষ দিনগুলোতে শাহ নিজের সাংবাদিক সম্মেলন ও সাক্ষাৎকারগুলোতে কয়েকবার বিষয়টি উত্থাপন করে। ভাড়াটে লোকদের শাসন টিকিয়ে রাখতে ইরানী জাতি ও বিপ্লবের নেতাদের ভীতি প্রদর্শনই ছিল শাহ ও আমেরিকার লক্ষ্য। তবে এ রকম ফন্দি মুসলমান বিপ্লবীদের ঠকাতে পারেনি।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে, ইরানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পরিকল্পনা রূপায়নে আমেরিকা কাজ শুরু করে। অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা এবং শোষক ও তাদের চরদের প্রচারণা ও দারিদ্র্য, শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি, কুর্দীস্তান, খুজেস্তান, বালুচিস্তান, তুর্কমেন সাহরা ও পশ্চিমাঞ্চলীয় আজার বাইজান প্রদেশগুলোতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির মত পরিস্থিতি আমেরিকাকে স্বীয় পরিকল্পনা রূপায়নে উৎসাহ যোগায়। বৃহৎ শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ আমেরিকার অনুচররা এসব এলাকা, বিশেষ করে কুর্দীস্তান প্রদেশে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। অস্থায়ী সরকারের নিয়োজিত কুর্দীস্তানের গভর্ণর জেনারেল একটি ইসলাম-বিরোধী উপদলের সাথে যুক্ত ছিল। সামরিক ঘাঁটিগুলো লুট এবং গভর্ণর জেনারেলের দেয়া বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রতিবিপ্লবীরা কুর্দীস্তান প্রদেশে গোলযোগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

এ সমস্যা নিরসনে ৩ জন অস্থায়ী সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত "শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদল" ঐসব উপদল ও তাদের নেতাদের ব্যাপারে ছিল সিদ্ধান্তহীন। এ:দের সাথে পাহলভী সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অজুহাতে এসব উপদল প্রচার করে যে, তারা কুর্দী জনগণকে সমর্থন করে। তারা পুনর্গঠন ক্রুসেড ও ভূমি স্বত্বত্যাগ কমিটির মত বিপ্লবী সংগঠন-সমূহের সদস্যদের হত্যা করে। এরা কুর্দীস্তানে সামন্তবাদ উৎখাতের চেষ্টা করছিল। কোন কুর্দ তাদের প্রকৃত মতলব জানলে ও তাদের সাথে সহযোগিতা না করলে এই প্রতিবিপ্লবীরা ঐ কুর্দদের হত্যা করত। এসব উপদলের প্রতি অস্থায়ী সরকারের উদার নীতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এবং ইরানকে খণ্ডিত করার চক্রান্ত রূপায়নে আমেরিকাকে সুযোগ করে দেয়। অস্থায়ী সরকারের পতনের পরেই কেবল এসব প্রতিবিপ্লবীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

কুর্দীস্তানের ভৌগলিক অবস্থান এমনই যে, ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাক নিজেদের অভিন্ন সীমান্তে কুর্দী সমস্যার সম্মুখীন। অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পরে শোষকদের চক্রান্তের পরিণতিতে এ সমস্যা দেখা দেয়। নিজেদের চক্রান্ত রূপায়নে উপনিবেশবাদীরা শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়গত পার্থক্যকেও কাজে লাগায়। তবে ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইরানে শিয়া ও সুন্নীদের এবং বিশ্বে সকল মুসলমানকে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে, তার ফলে শোষকদের ফন্দি কাজে লাগেনি।

বিশ্বের মুসলমানরা উপলব্ধি করেছে, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ), পবিত্র কোরান, কাবা ও শেষ বিচারের দিনের ওপর বিশ্বাস নিয়ে তারা বিশ্ব নাস্তিক্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করতে পারে। বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা, তাদের বিশাল ভূ-খণ্ড, প্রকৃত সম্পদ ও তাদের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বলা যায়, তারা আজ ঐক্যবদ্ধ হলে বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই, যা তাদের সমকক্ষ হতে পারে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখলে ও নিজেদের ওপর নির্ভর করলে তারা বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে, সকল শক্তিকে পারবে অপমানিত করতে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব সকল মুসলমান জাতিকে, বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই এদের মধ্যে শোষকদের রোপণ করা অসন্তোষের কারণে এদের অনেকেই দুর্বল হয়েছে। এ দুর্বলতা এতই ব্যাপক যে, ৩০ লাখের কম ইহুদী ১৩ কোটির বেশী আরব মুসলমানকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে। লুণ্ঠনকারী বিশ্ব শক্তিবর্গের সৃষ্ট সমস্যা ও দুর্দশা সত্ত্বেও ইরানী মুসলমান জাতি মুসলমানদের মর্যাদা পুনঃস্থাপন ও গোটা দুনিয়ায় একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় সকল মুসলমান ভাইয়ের সাথে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

সরকারের প্রধান ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শন

একবারে একটি চক্রান্ত যথেষ্ট নয়, তাই ইরানী ইসলামী বিপ্লবের শত্রুরা নিজেদের দু-একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও যাতে গোটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারে, সেজন্যে অতিরিক্ত কিছু ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী নেয়।

বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরে ইরানের অভ্যন্তরে আমেরিকার চররা সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু করে। শহরের রাস্তায় রাতের আঁধারে তারা বহু বিপ্লবী রক্ষী খুন করে। এরপর সাম্রাজ্যবাদীরা সন্ত্রাসবাদ শুরু করে, ক্রমান্বয়ে তৎপরতা জোরদার করে, প্রধান-প্রধান ব্যক্তি ও জনতার প্রকৃত খেদমতকারীদের হত্যা করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের মাত্র দু'মাস পরে

www.pathagar.com

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম চীফ অব স্টাফ লেঃ জেনারেল কারানি খুনীদের প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। আমেরিকান মদদপুষ্ট কুর্দী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অস্থায়ী সরকার তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তার মৃত্যুর পরে প্রখ্যাত ধর্মীয় জ্ঞানী আয়াতুল্লাহ মুতাহারীকে খুন করা হয়। মুতাহারী ছিল বিপ্লবী পরিষদের প্রধান। ১৯৭৯ সালের ১লা মে বিপ্লবী পরিষদের অধিবেশন শেষে তেহরানের এক রাস্তা দিয়ে আসার সময় মধ্যরাতে তাকে খুন করা হয়। ইসলামী, পশ্চিমা ও প্রাচ্যের মতাদর্শ সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানের কারণে তিনি আদর্শগত দিক থেকে ইসলামী বিপ্লবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর হত্যাই ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে বিপ্লবের শত্রুদের আতংকের প্রমাণ।

শহীদ মোফাত্তেহ, কাজী তাবাতাবাঈ, ডঃ বেহেশতী, রাজাঈ ও বাহানূরের মত প্রধান ব্যক্তিত্বদের হত্যা এবং হাশেমী রফসানজানি, খামেনী ও ইসলামী বিপ্লব অব্যাহত রাখায় আন্তরিকভাবে সচেষ্ট কয়েকজন সুন্নী ধর্মীয় নেতার প্রাণনাশের চেষ্টা প্রমাণ করে যে, ইসলামী চিন্তাবিদরা ইসলামের শত্রুদের সর্বাধিক আতংকিত করেছিলেন। যদিও কোন ইসলামী চিন্তাবিদের পরলোক গমন বিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষতি করে, তথাপি এর ফলে ইরানী জনগণের সংকল্প আরো দৃঢ় হয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামী বিপ্লবের যে বিশেষ দিকটি এড়িয়ে গেছে, তা হচ্ছে, এর স্বাতন্ত্র্য। এ বিপ্লব ইরানী জাতির প্রতিটি মানুষের। ইরানী জাতির রাজনৈতিক চেতনা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, তারা নেতাদের হত্যায় আর হতাশ হয় না, বরং এসব হত্যাকাণ্ডের ফলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্যে তাদের সংকল্প দৃঢ় হয়।

নেতৃত্বে ভাঙ্গন ধরানো ও প্রধান ব্যক্তিদের খুনের চক্রান্ত

বিপ্লবের নেতা হিসেবে ইমামের ভাবমূর্তি নিজেদের আভ্যন্তরীণ চরদের সাহায্যে ভেঙ্গে দেয়াই ছিল বিপ্লবের শত্রুদের আরেকটি চক্রান্ত। কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, এমনকি ধর্মীয় নয়, এমন নেতাদের বড় করে দেখিয়ে তারা ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব দুর্বল করার চেষ্টা করে। ধর্মীয় নয়, এমন নেতাদের মধ্যে ডঃ মোসাদ্দেকও ছিলেন। বিপ্লবের বিজয়ের বহু আগে এ নেতারা পরলোক গমন করেছেন।

কিছু ধর্মীয় নেতাকে বড় করে দেখিয়ে ও অন্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে এ চক্রান্ত কার্যকর করে বিদেশী মদদপুষ্ট রাজনৈতিক উপদলগুলো। অথচ এসব নেতার সকলেই ইমামের প্রতি নিবেদিত। তারা একাজে এমন কিছু নেতাকে বেছে নেয়, যাদেরকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নেতৃত্বের অবস্থানে বসার জন্যে ইচ্ছেমত ঘোরানো-ফেরানো যাবে। তারা এমন কিছু ধর্মীয় নেতার নামে বদনাম

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করে, যাদের ওপর ইমামের আস্থা ছিল। অথচ তারা বলে বেড়ায় যে, ইমাম তাদের ওপর আস্থা রাখেন না।

এ বিপজ্জনক চক্রান্ত রূপায়িত হলে, তা ইসলামী বিপ্লবের জন্যে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনত। বিপ্লবের সেবায় নিয়োজিত নেতাদের বদনাম করার মাধ্যমে নেতৃত্বে ভাঙ্গন ধরলে, তা বিপ্লবকে এতই দুর্বল করত যে, বিশ্ব নিপীড়কদের ইরানে প্রত্যাবর্তনের পথ হত প্রশস্ত। কিন্তু জনতার সচেতনতা এবং দুর্নাম রটানো হয়েছিল যাদের নামে, তাদের সঠিক কৌশলের জন্যে এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

অতীতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ ডঃ মোসাদ্দেকের মত নেতাদের বড় করে দেখানোর ব্যাপারে প্রতিবিপ্লবীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূল পথ থেকে বিপ্লবকে বিচ্যুত করা। বিপ্লবের বিজয়ের ৩ বছর পরে মোসাদ্দেকের মৃত্যু-বার্ষিকীতে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাতীয় ফ্রন্টসহ অন্যান্য বিদেশী মদদপুষ্ট ভাড়াটে সংগঠন বিপ্লবের ধর্মীয় নেতাদের ভাবমূর্তি বিকৃত করে।

এসব উপদল মোসাদ্দেককে জাতীয়তাবাদী মনে করে। এর মধ্য দিয়েই ঐ সংগ্রামের অনৈসলামী চেহারা ফুটে ওঠে। একটি ইসলামী আন্দোলনে সবসময়ই জাতীয়তাবাদ থাকে। কিন্তু একজন জাতীয়তাবাদী কখনই ইসলামী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে না। ইসলাম কখনো কোন বিশেষ দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। তথাপি ইসলাম প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা সমর্থন করে। অন্য সব অন্তর্ঘাতী কাজের মত, নেতার ভাবমূর্তি ও ইসলামী বিপ্লবের ধর্মীয় চরিত্র ধ্বংসের এই বিদেশী সমর্থিত চক্রান্তও পরাজিত হয়। বর্তমানে ইরানী জনগণ ইসলামী বিপ্লবের এ দুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিপ্লবের বিজয় অর্জনে এ দুই উপাদান বিপুল সাহায্য করেছে।

তাবাস ষড়যন্ত্র

তেহরানে আমেরিকান গোয়েন্দা আখড়া দখলের মাধ্যমে ইমামের পথের মুসলমান ছাত্র অনুসারীরা যে বিপ্লবী কাজ করে, তা ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ওপর ইরানী জাতির প্রচণ্ড আঘাত। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং প্রচারণার সাহায্যে আমেরিকা বিশ্বের জনগণের মনে এক অদৃশ্য দৈত্যের রূপ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। তেহরানে এই রূপকথার দৈত্যের গোয়েন্দা আস্তানা দখল প্রমাণ করল যে, আমেরিকা খালি পিঁপে ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বের জনগণের হতবাক দৃষ্টির সামনে খান্-খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের অজেয় ক্ষমতার উপকথা।

আমেরিকান গোয়েন্দা আখড়া দখলের সময়ে (ইরানী জনগণ এ ঘটনাকে দ্বিতীয় বিপ্লব মনে করে) আমেরিকা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন ছিল তার অজেয় ক্ষমতা নিয়ে গড়ে ওঠা উপকথা গুঁড়িয়ে যাওয়ায়। এ ব্যাপারে আমেরিকার ধারণা সঠিক ছিল। কারণ এ ঘটনার পরেই পাকিস্তানের মত ইসলামী দেশগুলোতে আমেরিকান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর হামলা পরিচালিত হয়। এ পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে আমেরিকা সরকার ইসলামী ইরানের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র করে।

সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী প্রচার যন্ত্র বলতে থাকে যে, "গোয়েন্দা আস্তানা" দখলের বিপ্লবী কাজটি বেআইনী, তা সকল আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু তারা কখনই এ কথার জবাব দেয়নি যে, কোন দূতাবাসে গুপ্তচর বৃত্তির সরঞ্জাম আইনসিদ্ধ কি-না।

তাদের প্রচারণার মুখে ইরানকে নতজানু করতে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা ১৯৭৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে এবং ১৯৮০ সালের ৩০শে এপ্রিল আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহে ইরানী সম্পদ আটক করে। এসব ষড়যন্ত্রেও ইরান নতজানু না হওয়ায় আমেরিকা সরাসরি হস্তক্ষেপের পথ ধরে।

বনি সদর আমেরিকাপন্থী সরকার গঠনের চেষ্টা করছিল কিন্তু সফল হয়নি। ইসলামী পরামর্শক পরিষদ মুহাম্মদ আলী রাজাই-এর মন্ত্রিসভাকে অনুমোদন করে। পরামর্শক পরিষদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইমাম ও ইসলামী বিপ্লবের প্রতি অনুগত। রাজাই বিপ্লবের ইসলামী ও স্বাধীন চরিত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। এটা বনি সদরের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজাই মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে ইরানে একটি উদারনৈতিক সরকারের ব্যাপারে আমেরিকার আশা বিফল হয়। এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদী প্রচারযন্ত্র রাজাই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। এ প্রচারযন্ত্র বনি সদর এবং ইরানে সক্রিয় অন্যান্য আমেরিকান চরের সাথে সম্পর্কিত ছিল। ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে শুরু হয় সর্বাপেক্ষা তীব্র সমালোচনা। এ ব্যাপারে আমেরিকার নৈরাশ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে ইরানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলা শুরু করার জন্যে বাথপন্থী ভাড়াটেদের নির্দেশ দেয়। রাজাই মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র কয়েক দিন পরে ১৯৮০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর এ হামলা শুরু হয়। স্থল ও নৌ হামলার সাথে সাথে বাথপন্থী বিমানগুলো তেহরানসহ কয়েকটি সামরিক বিমান বন্দরে আক্রমণ চালায়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন দেশ, বিশেষতঃ মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে না। বিপ্লবের নেতা ও অন্যান্য ইরানী কর্তৃপক্ষ এমন একদিনের আশা করেছিলেন, যেদিন ইরাকসহ সকল ইসলামী দেশের বাহিনী ফিলিস্তিন মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কুদস দখলকারী সরকার তথা ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে শুরু করবে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের নেতারা সবসময়ই পূর্ব ও পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিদের আধিপত্য থেকে সকল স্থানের বঞ্চিতদের মুক্ত করতে সকল মুসলমানের সমন্বয়ে এক বিশাল ইসলামী বাহিনী গঠনের কথা চিন্তা করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা দিতে বিশ্বাসঘাতক সাদ্দাম ইরান আক্রমণ করে, পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দুই মুসলমান জাতির বাহিনীকেই ব্যস্ত রেখেছে। অথচ ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে এ দুই দেশের বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

আশ্চর্যজনক যে, "আরবী জাতীয়তাবাদের" অজুহাতে ইরান হামলাকারী সাদ্দাম তার চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময়ে ইতিমধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরানে খুজেস্তানের হাজার-হাজার আরবকে হত্যা করেছে।

এ যুদ্ধ কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেরই রক্ষা করে। আগ্রাসনের শিকার হওয়ার পরে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ইরানের জন্যে আইনসিদ্ধ। ইরাকী বাথপন্থী সরকার রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী এবং মিসর, জর্ডান, সউদী আরব, মরক্কো, ওমান ও পারস্য উপসাগরে শেখ শাসিত রাজ্যগুলোর মত বৃহৎ শক্তিবর্গের চরদের সমর্থন পাচ্ছে। অথচ ইরান গুটিকয় দেশের রাজনৈতিক সমর্থন পায় এবং এককভাবে লড়াই চালায়। যুদ্ধের শুরুতে বনি সদরের কারণে ইরানী সশস্ত্র বাহিনী কয়েকটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বনি সদর সর্বাধিনায়ক হিসেবে মনে করেছিল ইরান জয়লাভ করলে আমেরিকা ও তার নিজের স্বার্থের ক্ষতি হবে। বনি সদরকে বরখাস্ত করার পরে ইসলামী বাহিনী বিজয়ের উদ্দেশ্যে লড়াই শুরু করে এবং নিকট ভবিষ্যতে তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবে। এ বিজয়ের ফলে ইরাকে একটি জনপ্রিয় সরকারও গঠিত হবে।

১৯৮০ সালের ২৫শে এপ্রিল ৩ হাজার কম্যাণ্ডো, মটর সাইকেল, সামরিক জীপগাড়ী, প্রচুর গ্রেনেড, কামান ও মেশিনগান নিয়ে ১৮টি পরিবহণ বিমান ও ২০টি হেলিকপ্টার লুকিয়ে ইরানী আকাশসীমায় প্রবেশ করে এবং খোরাসান প্রদেশের তাবাস শহরের কাছে এক মরুভূমিতে অবতরণ করে।

এ রকম সামরিক শক্তি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ আল্লাহর সেটাই ইচ্ছে ছিল। এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে ক্রুরা কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এ দায়িত্ব ছিল গোয়েন্দাদের উদ্ধার। তাদেরকে তাবাস মরুভূমিতে ৬টি হেলিকপ্টার, একটি বিমান, কয়েকটি জীপ, ৬টি মোটর সাইকেল, ৩০ হাজার ফাটানো গ্রেনেড এবং কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ আমেরিকান কম্যাণ্ডোর লাশ ফেলে ইরান ত্যাগ করতে হয়। সূরা ফিলে কোরানের ভাষ্যে অনুরূপ এক ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ইসলাম আগমনের পূর্ব-সময়ের আরবে হস্তিসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী পবিত্র কাবা ধ্বংস করতে

www.pathagar.com

আসে। তারা মক্কা আক্রমণ করে। কিন্তু ঐ বাহিনীর সকলেই খুব উঁচু থেকে অসংখ্য ছোট-ছোট পাখীর ফেলা ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে ধ্বংস হয়। ইরানী জাতি দেখল, আল্লাহর ইচ্ছায় তাবাস মরুভূমিতে বালুকণা বাতাসে উড়তে থাকে, এতে অন্ধ হয়ে পড়ে শত্রু ও তার "হাতিগুলো।"

নওজেহ'র ব্যর্থ অভ্যুত্থান

একদল প্রতারিত সেনা ও পলাতক চরদের সাহায্যে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোই ছিল ইরানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের পরবর্তী চক্রান্ত। এ দায়িত্ব বখতিয়ারের ওপর অর্পণ করে আমেরিকা সরকার। প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহও করা হয়। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু চেয়েছেন যে, ইসলামী বিপ্লব সদা বিজয়ী হোক, সেহেতু ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী ১৯৮০ সালের ৯ই জুলাই রাতে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে চক্রান্তে সংশ্লিষ্ট চরদের গ্রেফতার করে। অভ্যুত্থানকারীরা তেহরান ও কোমে, বিশেষতঃ ইমাম খোমেনীর বাড়ীতে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বোমা বর্ষণের পরিকল্পনা করেছিল। এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে রয়েছে মজলিস, বিপ্লবী রক্ষী কেন্দ্রসমূহ ইত্যাদি। একটি "সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকার" প্রতিষ্ঠার জন্যে নওজেহ বিমান ঘাঁটি থেকে জঙ্গী বিমানগুলো উড্ডীন হওয়ার কথা। এ চক্রান্তে বখতিয়ার যদি সফল হত, তাহলেও মনে রাখা দরকার যে, বিপ্লবোত্তর ইরানে কোন ধরনের অভ্যুত্থান সফল হবে না। ইরানের জনগণ একটি জনপ্রিয়, স্বাধীন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে চেষ্টা করেছে, তার পরে কোন নির্ভরশীল সরকার মেনে নেবে না।

অভিজ্ঞতা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা নেয়া উচিত যে, ইরানী মুসলমানরা নিজেদের ইসলামী সরকার সমর্থন করে। কোন জনগণের বিপ্লব, বিশেষতঃ ইসলামী বিপ্লব উৎখাত করা সহজ নয়।

ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ

এত কেলেঙ্কারিজনক প্রচেষ্টা ও পরাজয়ের পরে আমেরিকা ইরানে একটি উদারনৈতিক সরকার গঠনের ওপর আশা করতে থাকে। ইতিপূর্বে আমেরিকাকে সবুজ সঙ্কেত প্রদানকারী আবুল হাসান বনি সদর এ রকম একটি সরকার গঠন করবে বলে মনে করা হয়েছিল। বহুজনকে প্রতারণাকারী ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত বনি সদর বাজারগান সরকারের চেয়েও আমেরিকার শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সমর্থক ছিল।

www.pathagar.com

ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ কেবল বিপ্লবের শত্রুদেরই পরাজিত করেনি, দুনিয়ার সামনে ইসলামী বিপ্লবকে পরিচিত করতেও বিরাট ভূমিকা পালন করে। প্রভুদের স্বার্থ রক্ষায় ইরাকের বাথপন্থী সরকার সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য অপরাধও করে। ইরাকের ভাড়াটে সৈন্যরা সম্ভাব্য সব ধরনের অস্ত্র নিয়ে ইরানী নগরগুলো হামলা করে, হাসপাতাল, মসজিদ ও আবাসিক এলাকাগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ; বেসামরিক লোকজন চাপা পড়ে ধ্বংসস্তূপের নীচে। এ অমানবিক আক্রমণ সত্ত্বেও ইরানী সশস্ত্র বাহিনী তাদের ইসলামী বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে কখনও কোন বেসামরিক এলাকায় হামলা চালায়নি, এমনকি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন লোকজনের উদ্দেশে বর্ষণ করেনি একটিও বুলেট।

এখন উৎখাত হবার সম্ভাবনার কাছাকাছি এসে সাদ্দাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে ইরানকে বাধ্য করার জন্যে জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপক চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজের পতনোন্মুখ সরকার টিকিয়ে রাখার আশায় এটা করছে। ইরান শান্তি চায় তবে সেই শান্তি চায়, যার মধ্যে আগ্রাসনের কণামাত্র নিহিত নেই। সাদ্দাম শান্তি চায় না, এটাই সত্য কথা। কারণ সে শান্তি চাইলে বাহিনী প্রত্যাহার করত, অবসান ঘটাত আগ্রাসনের ; মধ্যস্থতা করার জন্য কারও দরকার হত না।

নিজেদেরকে বিশ্ব নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের রক্ষাকারী মনে করে বলেই ইরানী মুসলমান যোদ্ধারা ইরাকী সেনাবাহিনীকে পিছু হটাবে, অপমানিত করে ঠেলে দেবে তাদের সীমান্তের মধ্যে। ইরাকের অভ্যন্তরে বিধ্বস্ত বিমানের ইরানী বৈমানিকদের ইরান প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে যে ইরাকী জনতা, তারা সাদ্দামের ইহুদীপন্থী বিশ্বাস ঘাতক সরকারকে আর সইতে পারছে না।

ধাপে ধাপে অভ্যুত্থানের জন্যে বনি সদরের ব্যর্থ চেষ্টা

ইসলামী বিপ্লবের ফলে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে যে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীর, তার কাছে ইরানে পশ্চিমাপন্থী সরকারের চেয়ে অধিকতর সুবিধাজনক আর কিছু নেই। পশ্চিমা ধাঁচ ও সংস্কারবাদী নীতির কারণে অস্থায়ী সরকারই ছিল এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রথম ভরসা। এ সরকারের পতনের পরে আমেরিকা বনি সদরের ওপর ভরসা করতে শুরু করে। বনি সদর প্যারিসে ইমাম খোমেনীর সহযোগীদের একজন ছিল। সে ঐ সময়ে ইরানী জনগণের কাছে নিজের ইসলামী ভাবমূর্তি তুলে ধরত। নির্বাচনের আগে সে বক্তৃতা দেয়া ও শ্লোগান রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, নির্বাহী কাজ-কর্ম বাদ দেয়। এভাবে সে নিজের অযোগ্যতা ও প্রকৃত চরিত্র ঢেকে রাখে। বিভিন্ন কৌশল করে সে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১ কোটির বেশী ভোটে জয়লাভ করে।

www.pathagar.com

বনি সদর ও তার পশ্চিমা আসক্ত কয়েকজন সহকর্মীর কাজ ছিল ইসলামী বিপ্লবকে বিচ্যুত করা ও ইরানে আমেরিকা সরকারের পুনঃপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করা। এ প্রবেশ হবে ইরানের নির্বাহী ব্যবস্থার উচ্চ পর্যায়ে। এর সমর্থনে বহু প্রমাণ আছে। সেসব প্রমাণের মধ্যে তেহরানে আমেরিকান গোয়েন্দা আস্তানা থেকে উদ্‌ঘাটিত দলিল-দস্তাবেজ। এসব দলিলে দেখা যায়, বনি সদর ও তার সহযোগীরা আমেরিকা সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত ছিল। ইরানী সংবাদপত্রে এসব দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী পরামর্শক পরিষদের (মজলিস) জনৈক সদস্যের দুঃখজনক স্মৃতিও রয়েছে। মজলিসে আর্দেস্তানের জনগণের প্রতিনিধি নূরুল্লাহ তাবাতাবাঈ নেজাদ তার মৃত্যুর পূর্বে বর্তমান লেখককে এ ঘটনা বলেন। ১৯৮১ সালের ২৮শে জুন ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দলের সদর দফতরে বোমা বিস্ফোরণে তিনি শহীদ হন। তিনি যখন এ ঘটনা বলেন, তখনও বনি সদর প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন ঃ বিপ্লবের বিজয়ের প্রাক্কালে—১৯৭৯'র শীত মৌসুমে—তেহরানের পূর্বে একটি মসজিদে বক্তৃতা দেয়ার সময় আমাকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ এলাকার থানায় আটক রাখা হয়। মাঝ রাতে, আমি যে ঘরে আটক ছিলাম, সে ঘরে থানার প্রধান এসে আমার সাথে আলাপ করে। সে বলে, "তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ। রাজতন্ত্র যে উৎখাত হবে, তা সত্যি। তবে তোমাদের জানা উচিত। তোমরা নিজেদের ঈপ্সিত সরকার (ইসলামী প্রজাতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।"

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "একথার সমর্থনে কি প্রমাণ আছে?"

সে পাল্টা প্রশ্ন করলো ঃ "বনি সদর, কুতুবজাদেহ, ডঃ ইয়াজদিকে চেন?"

উত্তর দিলাম ঃ "আমি কেবল ডঃ ইয়াজদির নাম শুনেছি।"

থানা প্রধান মুখে হাসি এনে আমাকে বললো ঃ "ইমাম খোমেনীর কাছাকাছি হওয়ার জন্যে ও দেশের মধ্যে উর্ধতন নির্বাহী পদ পাওয়ার জন্যে আমেরিকা এসব লোক নিয়োগ করেছে। ইরানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া এদের উদ্দেশ্য।

এ কথায় অবিশ্বাস করে আমি হাসলাম, মনে মনে ভাবলাম, বিপ্লবের অগ্রগতি বিঘ্নিত করতে শাহের চরদের এটাও একটা কৌশল।

পরে যখন বাজারগানকে সাথে নিয়ে ডঃ ইয়াজদি আলজিয়ার্সে কার্টারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজিনস্কির সাথে করমর্দন করে আলাপ চালায়, তার ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে কায়হানে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে; যখন জিম্মীদের মুক্ত করতে আমেরিকার সাথে সহযোগিতা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাজারগান ইসলামী বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; যখন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বনি সদর রাজাই-এর মন্ত্রি পরিষদ উৎখাতে ও

www.pathagar.com

আমেরিকাপন্থী সরকার গঠনে আমেরিকা সরকারের সাথে কণ্ঠ মেলায় এবং ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময় অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ করে; তখনই আমার ঐ থানা প্রধানের কথা মনে পড়ে। সিদ্ধান্ত টানি, এসব লোকের সম্পর্কে ঐ থানা প্রধানের সঠিক তথ্য জানা ছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে এ লোকেরা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বনি সদরের কার্যকলাপ, পরনির্ভরশীল রাজনৈতিক উপদলসমূহের এবং ডঃ ইয়াজদি, কুতুবজাদেহ ও অন্যান্য পশ্চিমাঘেঁষা ব্যক্তির সাথে তার ঐক্যের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করা, ধীরে ধীরে ইসলামী বিপ্লবকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

নিজের প্রেসিডেন্টের পদ ব্যবহার করায়, সে-ই ছিল এ প্রচেষ্টার কেন্দ্র। ইসলামী বিপ্লব ও এ বিপ্লবের প্রতি অনুগতদের সমালোচনা করে তার ভাষণগুলো সত্য বলে মনে হত। পূর্ব ও পশ্চিমা ঘেঁষা উপদলগুলোর সাথে তার সম্পর্ক ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা ধ্বংসে তার চেষ্টাকে সাহায্য করেছে।

যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদের সুযোগ নিয়ে বনি সদর নওজেহ অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্ট অনেককে মুক্ত করে দেয়, এদের কেউ কেউ রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদেশে চলে যায়। ইরানী জনগণ ধীরে ধীরে বনি সদরের ও তার সহযোগীদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে

এ বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ যখন প্রকাশের পথে, সে সময় (১৯৮২'র এপ্রিল) সেনাবাহিনীর ইসলামী বিপ্লবী আদালত ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত এক ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে। এ ষড়যন্ত্রের প্রধান পরিচালক ছিল সাদেক কুতুবজাদেহ। গ্রেফতারের পরে, টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে কুতুবজাদেহ স্বীকার করে যে, তার সন্ত্রাসবাদী সাংগঠনিক ব্যবস্থা ইমাম খোমেনী, সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্যবর্গ (প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের সভাপতি, জনাব খামেনী, ইসলামী পরামর্শক পরিষদের স্পীকার ও সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদে ইমামের প্রতিনিধি হোজ্জাতুল ইসলাম হাশেমী রফসানজানিসহ)-দের খুন করার মতলব আঁটে। ইমামের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ ও জামরানে গোলাবর্ষণ করে এটা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইমাম খোমেনী ও সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও জামরানের ১০ সহস্রাধিক লোক তাহলে মারা যেত।

কুতুবজাদেহ আরো স্বীকার করে যে, সে উইল এলোন নামে একজনের সাথে যোগাযোগ রাখত। এ ব্যক্তি ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য বলে পরিচয় দিত। চক্রান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আসত এ ব্যক্তির মাধ্যমেই। তবে উইল এলোন এ সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের সাথে সি আইএ'র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল।

www.pathagar.com

এবং সকল অপরাধকারী তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠে। বনি সদর সব সময় জনগণের পক্ষে থাকত বলে দাবী করত। সে জনতার অংশগ্রহণ চাইত। অথচ জনতা প্রতিবিপ্লবীদের মোকাবিলা করা শুরু করলে, তাদেরকে সে "লাঠিধারী" বলে অভিহিত করে।

জনগণ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে এবং দাবী করে যে, বনি সদর সম্পর্কে ইমাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। ইমাম খোমেনী বনি সদরের প্রকৃত চরিত্র জেনেছেন। বনি সদরকে বিদেশী মদদপুষ্ট গ্রুপগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ইমাম বহু চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর, ১৯৮১ সালের ১০ই জুন ইমাম খোমেনী বনি সদরকে সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কের পদচ্যুত করেন। বনি সদরের রাজনৈতিক যোগ্যতা নিয়ে মজলিসে ভোট হয়। ১৯০ জন উপস্থিত সদস্যের মধ্যে ১৭৭ জন তার যোগ্যতার বিপক্ষে ভোট দেয়।[২] ১৯৮৯ সালের ২১শে জুন নেতা হিসেবে ইমাম খোমেনী বনি সদরকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে খারিজ করেন।[১]

ইমাম খোমেনী কর্তৃক বনি সদরের পদচ্যুতি কেবল বৈধ ও সংবিধান অনুসারেই নয়, তা জনগণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। শাহ ইরান থেকে পালালে জনগণ যেমন আনন্দ করেছিল, বনি সদরের পদচ্যুতিতেও তেমনি আনন্দ করে।

একদিক থেকে বনি সদরের পদচ্যুতি শাহের উৎখাতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইসলামী পর্দার আড়ালে বনি সদর ইরানকে আবার আমেরিকার আধিপত্যাধীনে নেয়ার চেষ্ট করছিল। তার প্রকৃত চরিত্র জনগণের কাছে উন্মোচন করা না হলে, সে হয়ত ইসলামের নাম নিয়েই এ বিপ্লব ধ্বংস করত।

তাই ইরানী জাতি তার পদচ্যুতিতে আনন্দ করে ঠিকই করেছে। কারণ তারা জানত যে, তারা আরেকবার আমেরিকার শোষণের জিঞ্জির ভেঙ্গেছে। এ কারণেই জনগণ ১৯৮১ সালের ২৪শে আগষ্ট দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের ব্যাপক প্রচারণা, তাদের এদেশীয় চরদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ সত্ত্বেও ১ কোটি ৩০ লাখ ভোটে মোহাম্মদ আলী রাজাইকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। জনগণের এ ভোট প্রদান ইসলামী বিপ্লবের শত্রুদের ওপর আরেকটি আঘাত।

---

(১) সংবিধানের ১১০ ধারা অনুসারে নেতা হচ্ছেন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি আরেক জনকে সহকারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২) সংবিধানের ১১০ ধারার ৫ উপধারায় রয়েছে, মজলিস কোন প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিলে বা সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ সাব্যস্ত করলে যে, প্রেসিডেন্ট আইনগত দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছে, তখন নেতা প্রেসিডেন্ট পদ থেকে খারিজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

www.pathagar.com

তিরে'র ব্যর্থ অভ্যুত্থান

এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত তৎপরতায় বনি সদর ছিল নিছক ঘুটি। এ তৎপরতায় ইরানের অভ্যন্তরে প্রধান সক্রিয় সংগঠন ছিল মুজাহেদিন-ই-খালক। (এম কেও) এর প্রকৃত নেতা ছিল আমেরিকা সরকার। তাই বনি সদরের পদচ্যুতি আমেরিকার স্বার্থ, এমকেও'র বিপ্লব ও গণ-বিরোধী উদ্দেশ্য ও বিদেশী মদদপুষ্ট অন্যান্য গ্রুপের স্বার্থ বিপন্ন করে। বনি সদরের পদচ্যুতির মধ্য দিয়ে ইরানের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হারায়। এ অবস্থান থেকে শত্রুরা আইনের আশ্রয়ে থেকে বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারত। তাই প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশে অসন্তোষ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ইসলামী ব্যবস্থা উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের প্রধান ষড়যন্ত্র ছিল ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকল নেতাকে খুন এবং বিপ্লবী কমিটি ও আইআরজিসি কেন্দ্রগুলো দখলের পরে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ।

তারা জনগণ ব্যতীত আর সবকিছুর কথা চিন্তা করেছিল। আমেরিকা, প্রাক্তন শাহ, বনি সদর ও বিদেশী মদদপুষ্ট গ্রুপগুলো কখনই জনগণকে হিসেবের মধ্যে গণ্য করেনি। প্রকৃতপক্ষে জনগণই হচ্ছে বিপ্লবে ও তার স্থায়িত্বের প্রধান উপাদান। ইরানে শেষ দিনগুলোতে শাহ বলেছিল, সে ক্ষমতাচ্যুত হলে ইরানে আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ, গোলযোগ দেখা দেবে। বনি সদরও হুমকি দিয়েছিল যে, তার পদচ্যুতিতে গোলযোগ হবে। তারা কেউই চিন্তা করেনি যে, জনগণই তাদের বর্জন করেছে এবং জনগণ শোষকদের প্রলোভনে পড়ে গোলযোগ করবে না।

দেশের কর্মকর্তাদের ভীত করার যে ষড়যন্ত্র বনি সদরের সহযোগিতায় করা হয়েছিল, তা ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় দফতরে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে শুরু হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রধান বিচারপতি ডঃ বেহেশতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাই, মজলিসের স্পীকার হাসেমী রফসানজানি সহ বহু মজলিস সদস্যকে হত্যা করতে পারবে বলে আশা করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, এতে দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। তারা পরদিন ইসলামী বিপ্লবী আদালতসমূহের উর্ধতন কর্তপক্ষকে আতংকিত করা এবং বিপ্লবী কমিটি ও আইআরজিসি কেন্দ্রসমূহ আক্রমণ করারও সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে প্রধানমন্ত্রী ও মজলিসের স্পীকার ঐ সভায় যাননি। শহীদ মজলিস সদস্যদের যে সংখ্যা ছিল, তার ফলে মজলিসের কোরাম হতে অসুবিধা হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের চক্রান্তের পরবর্তী পর্যায়েও সফল হয়নি। শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

গভীর মেধা ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ডঃ বেহেশতি ও ইসলামী বিপ্লবের ৭২ জন সর্বাধিক বিশ্বস্ত সন্তান ২৮শে জুন অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় শহীদ হন। এই নিষ্পাপ শহীদদের রক্ত আরেকবার বিপ্লব বৃক্ষে রস সিঞ্চন করেছে,

www.pathagar.com

নিশ্চিত করেছে এই ঐশী আন্দোলনের অব্যাহত প্রবাহ। ডঃ বেহেশতির শাহাদৎ বরণ—যার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা, ব্যাপক জ্ঞান এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে আমেরিকা ও অন্যান্য শোষক ভয় পেত—এ ভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পদলেহীদের বেঁচে থাকার অবসান ঘটায়।

এই দুর্যোগময় ঘটনা জনতার সচেতনতা বাড়ায়, বৃদ্ধি করে পরাশক্তিদের বিরুদ্ধে জনতার ঐক্য। ইরানী জনগণ এই নিষ্পাপ শহীদদের নিয়ে পশথ নেয় যে, তারা কখনই কোন অবস্থাতেই শোষকদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। তারা জুলাইতে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ও মজলিসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ব্যাপক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সে প্রতিজ্ঞা পালন করে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে আমেরিকা সরকারের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসঘাতক চক্রান্ত প্রতিদিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের ব্যাপক প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে সাম্যবাদী বলে অভিহিত করা হয়। এ যাবৎকালের অজানা তত্ত্ব "পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র" এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতাদের এ নীতি অনুসরণ করা দেখে বিশ্ব শোষকরা ঘাবড়ে গেছে। তারা তাই ইসলামী ইরানে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। কেবল ইসলামী বিপ্লবের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই এ বিপ্লবের শত্রুরা যে এ তত্ত্ব ধ্বংসের চেষ্টা করবে, সেটা স্বাভাবিক।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদ সর্বাধিক আঘাত পেয়েছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ সবসময়ই জনগণকে প্রতারিত করতে প্রচার করছে যে, ইসলামী বিপ্লব সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে।

আমেরিকা সরকার নিপীড়িত জাতিসমূহকে ঠকানোর জন্যে তাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবের মত ইরানের ইসলামী বিপ্লবও একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে ও অপর বৃহৎ শক্তির পক্ষে। বিশ্ব নিপীড়কদের প্রচার মাধ্যমগুলো মুক্তিকামী জনতার মনে এ ধারণা জন্মে দেয়ার অব্যাহত চেষ্টা করছে যে, দুই পরাশক্তির কোন একটির প্রতি অনুগত না হলে কোন বিপ্লবই জয়লাভ করে না। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে এই মগজ ধোলাই পুরো কার্যকারিতা হয়েছে। বিশ্বের জনগণ এ বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র এবং "পূর্ব নয়, পশ্চিমও নয়" তত্ত্ব দেখে বুঝতে পেরেছে যে, বিশ্ব নিপীড়কদের প্রচার প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

এরকম সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে দিয়ে একটি পশ্চিমাপন্থী সরকার মানিয়ে নেয়া, যাতে জনগণ বিশ্বাস করে যে, তারা সাম্যবাদ থেকে সরে আসছে। ইরানের জনগণকে এমন বোঝাতে পারলে তারা বিপ্লবের নেতাদের

www.pathagar.com

সমর্থনদান বন্ধ করবে। নিজেদের সঠিক ও ইসলামী অবস্থান ছেড়ে পশ্চিমাপন্থী পুঁজিবাদ অবস্থান গ্রহণ করতে বিপ্লবের নেতাদের বাধ্য করাও এ রকম প্রচারের পেছনে আমেরিকা সরকারের উদ্দেশ্য।

এ উদ্দেশ্য সাধনে আমেরিকা সরকারের চররা ইরানের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। তারা প্রকৃত ও জঙ্গী ধর্মীয় নেতাদের সাম্যবাদী প্রবণতাসম্পন্ন বলে চিত্রিত করতে চায়।

১৩৫৯'র আবান মাসে (১৯৮০-র অক্টোবর-নবেম্বর) ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ওপর ইরাকী বাথপন্থী সরকারের আক্রমণের পাশাপাশি বনি সদর ও তার প্রতিবিপ্লবী সাঙ্গপাঙ্গদের মুখ 'ইসলামী বিপ্লব' পত্রিকা "গবেষণাভিত্তিক" ও "বৈজ্ঞানিকভাবে অনুমিত" বলে অভিহিত করে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে দেখানোর চেষ্টা করে যে, ইরানের শাসন ব্যবস্থা তুদেহ পার্টির প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অনুরূপ।

আমেরিকা সরকারের সাথে সম্পর্কিতরা বলে বেড়াচ্ছে, যেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে, তাই ইসলামী বিপ্লবের ওপর ভরসা রাখা যায় না। ইসলাম ও বিপ্লবের শত্রুরা পশ্চিমা ধরনের সরকার গঠনের জন্যে জনগণকে প্রস্তুত করতে চায়। যেসব জাতি ইসলামী বিপ্লবের ওপর আশা রেখেছে, তৈরী হচ্ছে নিজেদের বিপ্লবের জন্যে, তাদেরকেও হতাশ করতে চায়। ১৯৫৩ সালে তুদেহ পার্টি এ কর্মপরিকল্পনাই নিয়েছিল। ইরানে পাশ্চাত্য শাসন পুনঃ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এখানে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার হুমকি তুলে ধরার জন্যে তুদেহ পার্টিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ভালভাবেই জানত যে, জনগণ সাম্যবাদ থেকে রেহাই পেতে পশ্চিমা পুঁজিবাদে আশ্রয় নেবে। এভাবে ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থানের পটভূমি রচিত হয় এবং আমেরিকা সরকার ২৫ বছর ধরে আমাদের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে সক্ষম হয়।

এ ভুল ধারণা প্রচারকারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিপ্লবের ইসলামী চরিত্রের বিরোধীরা, পুঁজিবাদীরা, সকলে বনি সদরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইরানে এ ব্যর্থ প্রচেষ্টার পাশাপাশি বঞ্চিত জাতিদের হতাশ করতে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদীবাদী সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যম ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এ প্রচারণা বিশ্বের জনগণের মনে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হলে শুরু হয় আরেক ধরনের প্রচারণা। এর উদাহরণ ঃ ইরাকী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে ইসরাইলের কাছ থেকে ইরান অস্ত্র কিনছে। বিশ্বের জনগণ যখন জানে যে, ইরান বিপ্লবের পরে ইসরাইলে তেল রফতানী বন্ধ করেছে, তেহরানে ইহুদী দূতাবাসকে ফিলিস্তিনী দূতাবাসে পরিণত করেছে, ফিলিস্তিনীদের সমর্থনে তেলআবিবে অবস্থিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে যাতে বিশ্বের জনগণ বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, সেজন্যে রমজান মাসের শেষ

www.pathagar.com

ক্রবারকে 'কুদস দিবস' ঘোষণা করেছে, সে সময়েই শুরু হয়েছে এ প্রচারণা। ইহুদী প্রচার মাধ্যম এটি প্রচার করল আর এরপরে ইসরাইলী বাহিনী ইরাকে অস্ত্র সরবরাহে নিয়োজিত একটি জাহাজ আটক করল, ব্যাপারটি অদ্ভুত নয় কি? কিছু দিন আগে ইরাকীদের সাথে সমঝোতা করেই ইসরাইলী জেট জঙ্গী বিমানগুলো ইরাকের একটি আণবিক স্থাপনায় বোমা বর্ষণ করেছে। দু'দেশের সহযোগিতাকে আড়াল করতেই এটা করা হয়েছে।

বিপ্লব রফতানী

বিশ্বের জনগণ বারবার বিপ্লবের নেতা ও অন্যান্য কর্মকর্তার কাছ থেকে শুনেছেন যে, এ বিপ্লব অবশ্যই অন্যান্য দেশে রফতানী করতে হবে। এ বিষয়টি বাড়িয়ে শোষকদের প্রচার মাধ্যম ইসলামী বিপ্লবের সম্প্রসারণকামী চেহারা দেখানোর চেষ্টা করে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকার কখনই সম্প্রসারণকামী উদ্দেশ্য অনুসরণ করে না। বিপ্লব রফতানীর উদ্দেশ্য অন্য দেশ সামরিক আগ্রাসন নয়। মূলতঃ ইসলামী বিপ্লব কখনও অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না। এমনকি ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ শুরু হয়েছে ইরাকী হামলা দিয়ে। ইরান কেবল আগ্রাসন থেকে নিজ ভূ-খণ্ড রক্ষা করছে।

'বিপ্লব রফতানীর' অর্থ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা ও ইসলামী বিপ্লবে অর্জিত অগ্রগতি জানানো। যে বঞ্চিত জনতা শোষকদের আধিপত্যাধীনে দুর্দশাগ্রস্ত, ক্ষুধা বা সামরিক আগ্রাসনের ফলে যারা প্রতিদিন মরছে তাদের জানা উচিত যে, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামী বিপ্লব কি কি অগ্রগতি অর্জন করল।

নিজেদের সাফল্য দিয়ে শোষিত জনগণকে অবহিত করা এবং তাদের মুক্ত হতে সাহায্য করা ইরানী জনতার দায়িত্ব। সম্মেলন আয়োজন, বই প্রকাশ ও গণমাধ্যমের সাহায্যে এটা করা সম্ভব। কোন সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য নেই। তবে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যাধীন বার্তা সংস্থাগুলো ইরান সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বিকৃত করতে চায়।

ইসলামী বিপ্লবের পশ্চাতে কর্মরত শক্তিসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়া পূর্ব ও পশ্চিমের চরদের বিতাড়িত করার কাজে এখনও নিয়োজিত।

আবুল হাসান বনি সদর এরকম চরের উদাহরণ। আন্তর্জাতিক রেডক্রস যখন বলেছে যে, ইরানী বন্দীরা বিশ্বে চমৎকার ব্যবহার পাচ্ছে, তখন সে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বলেছে বন্দীদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। বন্দীদের ব্যাপারে ইরানকে অনুসরণ করার জন্যে রেডক্রস প্রস্তাব দিয়েছে।

বনি সদরের মত লোকদের অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে বিপ্লবের শত্রুদের ইসলামী সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে সাহায্য করেছে। ইসলামী বিপ্লবের অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক গতিময়তার ফলে এ বিপ্লব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বিকশিত হয়েছে। প্রতিদিন বিশ্বে এর সমর্থক বাড়ছে। বহু মানুষ, বিশেষতঃ আফ্রিকান ও এশীয়রা

www.pathagar.com

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ওপর আশা রেখেছে। ইমাম খোমেনীকে সকল স্থানের নিপীড়িতের নেতা হিসেবে উল্লেখ করে তারা সেদিনের অপেক্ষা করছে, যেদিন বিপ্লবের জোয়ার তাদের দেশ থেকেও শোষকদের উচ্ছেদ করবে।

বিভিন্ন জাতি ও সরকারসমূহের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন প্রয়োজন। বহু সরকার আছে, যারা কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তাই এসব সরকারকে জনগণের ওপর ইসলামী বিপ্লবের প্রভাব রুখতে হয়। এসব সরকার জানে যে, জনগণ বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে তারা নিজেদের ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, ঐ সব সরকারকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। তাই এসব সরকার বিপ্লবের পথে বাধা দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বিভিন্ন জাতি ইতিমধ্যেই নিজেদের মুক্ত করার পন্থা সম্পর্কে জেনেছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবই জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ পথ।

সম্পূরক

পূর্ববর্তী সরকারসমূহের বছরের পর বছরব্যাপী নিপীড়নমূলক শাসনের ফল-শ্রুতিতে গ্রামসমূহে অনুন্নত অবস্থার মূলোচ্ছেদ ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য।

স্বেচ্ছা শ্রমভিত্তিক বিপ্লবী সংগঠন জিহাদ-ই-সাজান্দেগী এ আদর্শ বাস্তবায়নে একটি শক্তিশালী অঙ্গ। এক্ষেত্রে এ সংগঠন চমৎকার সফল হয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যান ১৯৮১'র জানুয়ারী থেকে ১৯৮২'র জুন পর্যন্ত জিহাদ-ই-সাজান্দেগীর সাফল্য তুলে ধরে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেয়ায় অন্যান্য সংগঠনের মত জিহাদ-ই-সাজান্দেগীও বিপুল জনশক্তি ও ব্যবস্থা নিয়োজিত করেছে যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হলে আজ যুদ্ধে নিয়োজিত সকল শক্তি গ্রামীণ এলাকায় বিনির্মাণ কাজে যোগ দেবে।

নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়। এ বই লেখার সময় ৪টি প্রদেশে জিহাদ-ই-সাজান্দেগীর সাফল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়নি। অপর ৪টি প্রদেশ—খুজেস্তান, ইলাম, কারমানশাহ, কুর্দীস্তানে যুদ্ধ চলছে। হাজার-হাজার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো উল্লেখিত হয়নি।

এসব তথ্য আমাদের গর্ব নয়। তবে আল্লাহর রাহে যেসব জীবন গিয়েছে এবং আল্লাহকে সুখী করতে যে সময় ব্যয় করা হয়েছে, সেজন্যে আমরা আনন্দিত।

ব্যাখ্যা ঃ—"নবনির্মিত বলতে জিহাদ-ই সাজান্দেগীর শুরু করা ও সম্পূর্ণ করা এবং "সম্পূর্ণ" বলতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সূচীত যেসব পরিকল্পনা জিহাদ-ই-সাজান্দেগী সম্পন্ন করেছে, তা বোঝানো হয়েছে।

উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে সাফল্যসমূহ

কাজের ধরন	নবনির্মিত	সম্পূর্ণ	সংস্কারকৃত	
স্কুল	১০৬৩	৩২৪	২১৯	ইউনিট
গণ-গোছলখানা	১০১০	২৭১	৫৪৬	,,
সমাধিস্থান	২২৭	২৭	২১	,,
মসজিদ	৩৯১	১৭৮	৩৩৮	,,

www.pathagar.com

কাজের ধরন	নবনির্মিত	সম্পূর্ণ	সংস্কারকৃত	
ক্লিনিক	৬৮	২১	১০	ইউনিট
অভাবী গ্রামবাসীদের জন্য বাড়ী	৪২২	৮৩	১৫১	,,
গ্রামে পানি সরবরাহ	১৫২২	৩৮৮	২৫৫	গ্রাম
পাথর বিছানো রাস্তা	৩০৬৩	৯৭১	১১১১	কিঃ মিঃ
গ্রামীণ পথ	২২৮৪	৬২৩	৩৭০৭	,,
সেতু নির্মাণ	২২৮৪	৮২	৩১	সেতু
গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ	৯০৫	২০৭	১৪৫	গ্রাম
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	২১৬	৭	১	ইউনিট
বিভিন্ন ভবন নির্মাণ	২১৮১	৭৩৮	২৩২	,,

গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সার্ভিস

বিনামূল্যে চিকিৎসা	২১১৮৫৬৩	জন
জখমের চিকিৎসা ও ইঞ্জেকশনদান	১১০৭২৭০	,,
টীকাদান	৩৬৯৪২৬	,,
ওষুধ ও গুঁড়াদুধ বিনামূল্যে বিতরণ	১৭৫৫১৩৮৫	টি কেস
হাসপাতালে ভর্তি করা	১২৮৫	জন
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া রোগী	৪৭৭১৬	,,
গ্রামে পাঠানো চিকিৎসা দল	২৪৫৩৬	দল
ক্লিনিক স্থাপন	২৩০	ইউনিট
ফার্মেসী স্থাপন	২৪১	,,
স্বাস্থ্য রক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ	৫৮১৫৭০	কেস
স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ	৬২৪০৮	জন
পরিবেশ বিশুদ্ধকরণ	৬০৪০১	কেস
দাঁতের চিকিৎসা	৭৯২৭৬	জন
অন্যান্য চিকিৎসা সার্ভিস	৭০৪২৯	কেস

জিহাদ-ই-সাজ্জাদেগীর সাংস্কৃতিক সাফল্যসমূহ

আদর্শগত ক্লাস	৫৫৫৪০টি	অধিবেশন
আরবী ভাষার ক্লাস	২৭৪৪২ ,,	,,
সাক্ষরতা ক্লাস	২০৯৪০ ,,	,,
পাঠাগার	১০৫৮৩ ,,	ইউনিট
ভ্রাম্যমান পাঠাগার	৩৯৪৫ ,,	,,
বিভিন্ন প্রদর্শনী	৯৩৬৫ ,,	,,
চলচ্চিত্র ও নাটক অনুষ্ঠান	৩৬১১৯ ,,	,,
ভাষণ প্রদান	৪২৩৭৯ ,,	অধিবেশন
বিনামূল্যে বই বিতরণ	২০৮৩১৫৯	খণ্ড
বিনামূল্যে সাময়িকী বিতরণ	১৬৯৮৩৪৭	কপি
বিনামূল্যে বুলেটিন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ	৭৮৮১৪৪৬	,,
পোস্টার ও ছবি বিতরণ	৯০৯০৩২৫	,,
টেপে ধারণকৃত ভাষণ বিতরণ	১২৮৫২১	টি টেপ
গ্রাম গঠিত ইসলামী পরিষদ	১৩২০৪	

www.pathagar.com

জিহাদ-ই-সাজাদ্দেগীর কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহ

১—পানি সেচ

কাজের ধরন	নবনির্মিত	সম্পূর্ণ	সংস্কারকৃত	
অগভীর কূপ	১৩৩	৬	১৪	ইউনিট
আধা-গভীর কূপ	১৩৯	১৬	৪০	,,
গভীর কূপ	৪১৮	৬৯	৪৫	,,
ভূগর্ভস্থ খাল	১০২	৮৬	২৩৫০	,,
নিষ্কাশন	৩৬	১৩	১০	টি ব্যবস্থা
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	২৫৬	৩২	৩৫৫	,,
মাটির তৈরী বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৩৭৯	২৪	৬২	ইউনিট
কৃষিকাজে ব্যবহার্য পুকুর	২৯৮	৬৩	৭৭	,,

২—বিতরণ কর্মতৎপরতা

বীজ বিতরণ	৪৬২৭	টন
সার ,,	১৪৫১৭১	,,
কীটনাশক ,,	৩৬১৭	,,
তরল কীটনাশক ,,	১৮১৯৬১৭	লিটার
ট্রাক্টর ও কম্বাইন হার্ভেস্টার	৬৭৯২	ইউনিট
পানির পাম্প	১৩১১৯	,,
অন্যান্য কৃষি যন্ত্র	২৬২০২	,,
কৃষকদের দেয়া গরু	৪৫৩২	টি
,, ,, ভেড়া	২৬৭০১	,,
,, ,, হাঁস-মুরগী	১২২৮৮২১৬১	টি মুরগী
পশুখাদ্য বিতরণ	১৩৯৮২৮১৪৭	টন
চারা ,,	২০৩৭২৫	
পশু ওষুধ ,,	৪৪৭২৩৫	কেস
কৃষকদের দেয়া ঋণ	১৪৮১০৮৯৮	রিয়াল

৩—বিভিন্ন সার্ভিস

কৃষি যন্ত্র মেরামত	১১৯৩৯	ইউনিট
জমি আবাদে সহায়তা প্রদান	৯৫০৩৮২	হেক্টর
ফসল কাটায় ,, ,,	৮৮৬৮৯৬	,,
জিহাদ-ই-সাজাদ্দেগীর আবাদ করা জমি	৯৫৬০৯	,,
মেরামতশালা স্থাপন	৩৭	ইউনিট

৪—পশুপালন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেয়া সার্ভিস

পশু চিকিৎসা ক্লিনিক স্থাপন	১৭৭	ইউনিট
পশুপালন কেন্দ্র	১৩৯	,,
হাঁস-মুরগী ,,	১৫৮	,,
কৃষি ও পশুপালন প্রশিক্ষণ	১০১২১৮	জন
পশুদের টীকাদান	৪১২৭৯১৯৮	টি
পশু চিকিৎসা	১১৭৯১২৮১	টি
হাঁস-মুরগীর টীকাদান	২২৭৮৯৭২৮	টি মুরগী
খোয়াড় জীবাণুমুক্তকরণ	১৫৮২২৭	ইউনিট

—ঃ সমাপ্ত ঃ—